কবিতা বিষয়ক
ষাণ্মাসিক পত্রিকা

প্রথম বর্ষ | আত্মপ্রকাশ সংখ্যা | মে ২০২৩

প্রথম বর্ষ

■

আত্মপ্রকাশ সংখ্যা

■

মে ২০২৩

কবিতা বিষয়ক
ষাণ্মাসিক পত্রিকা

সম্পাদকীয় দপ্তর
গ্রাম ও ডাক : সাটুই
জেলা : মুর্শিদাবাদ-৭৪২৪০৫
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

E.mail : anwiikb@gmail.com
Mobile : 9474025147

মূল্য : ৫০ টাকা

সম্পাদকীয়

শব্দের মায়াজাল কথার বুনিয়াদ। দৈনিক জীবনযাপনের সতর্কতা অথবা অসতর্কতায় শব্দ বুননের ছান্দিক প্রয়াসে কবিতার জন্ম। শব্দেরা কখনো কখনো দুঃসাহসিকতায় বিষমকে মিলিয়ে দেয় — ইন্দ্রিয়ের সীমানা চুরমার করে দেয়। অর্থই মূল। কবি কখনো অর্থকে গৌণ করে শব্দের কাছে হাত পাতেন না। অকল্পিতপূর্ব অনুষঙ্গে দৃশ্যে আসে শ্রুতির স্পন্দন। শ্রুতির স্মৃতিতে দৃশ্যের ইঙ্গিত ভাসমান। শব্দের স্বরাজ্য বলে কিছু নেই। কবি শব্দের চলতি সীমাকে বারেবারেই লঙ্ঘন করেন — কারণ মূল অর্থের নিকট পৌঁছাতে কবির আকুল ইচ্ছা।

'অন্বী'-র আত্মপ্রকাশ সংখ্যায় কবিদের ঢেলে দেওয়া মধুরূপ কবিতাগুলিতে কখনো ফুটে উঠেছে সুগঠিত শাব্দিক চয়ন, আবার কখনো সমাজের সাম্প্রতিক চিত্রায়ণ। কোনও কোনও কবিতায় কবিরা মেতেছেন শব্দ-ভাষা-চিত্রকল্প নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। বাস্তবতার দলিলে মোড়া নানাবিধ বিষয়ের সুগঠিত বর্ণনও দেখা যায় কয়েকটি কবিতায়। কলমের খোঁচায় বাস্তবের নির্মম চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে পত্রিকার পাতায়।

শুধু কবিতায় নয়, তিন-তিনটি কাব্যগ্রন্থের গঠনমূলক আলোচনাও লেপ্‌টে রইল 'অন্বী'-র শরীরে। আশা, বছরে দু'বার 'অন্বী'-র প্রকাশ ঘটবে বাংলা সাহিত্য জগতে।

সূচি

কবিতা

বইয়ের আলোচনা

সাঁকো

অমিত কাশ্যপ

সাঁকোটির সামনে গেলে দুলে ওঠে
ওই মায়াটির মতো, সংসারের সামনে দাঁড়ালে
যেমন দুলে ওঠে প্রিয়মুখ সকল
ওই প্রিয়মুখের কথাই বলা হচ্ছে গীতায়

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, যা দেখছ সব মায়া
জুয়ার আড্ডায় হেরে গেলে, তোমার গেল
অন্যের হল, হোক, ভেব না, দান আসবে
তোমার হবে, আমার-তোমার বলে কিছু নেই

বাবা-মা সংসার ফাঁকা করে একদিন যান
তুমিও যাবে, তুমি ওই দুলে ওঠা ভোর দেখ
কেমন দুলে দুলে সকাল ওঠে, বড় হয়
ছোট সকালের একটা নাম, বড় সকালের আর একটা

দিন একটাই, মায়ার মতো জড়িয়ে যায়
আমরা শুধু এগিয়ে যাই অজানা কালের দিনে

অশ্রু ডানায়
তুষার ভট্টাচার্য

তোমার জন্য একটি সকাল জেগে ওঠে
ভোরের সবুজ পাতায়,
তোমার জন্য সারা দুপুর বসে থাকি
ধূসর স্মৃতির জানালায়,
তোমার জন্য আজও আনমনা উদাস
প্রেমিক হয়ে ঘুরে বেড়াই অশ্রু ডানায়,
ভালবাসার স্বপ্ন রঙীন রূপকথার গল্পগুলি কবেই
ভেসে গেছে মেঘলা বাদল হাওয়ায়,
দিনের পরে দিন চলে যায়
তবু তোমার শ্যামলা হাসি মুখের ছবি আঁকি
মাটির আয়নায়।

গাছ-সম্পর্ক
রামকিশোর ভট্টাচার্য

দু'একটা গাছের বন্ধুত্ব নিয়ে গর্ব করি খুব ।
পাতাদের পাড়ায় যাই, মাঝে মাঝে শিরায় শিরায়
নির্ভুল সবুজ মাখি। কয়েকটা চড়ুই-সকাল
কিম্বা ঘুঘু-দুপুরেরা পাশে বসে, সান্ত্বনা চায় ।
সান্ত্বনা আমাদের নিরীহ পাড়ায় গোধুলির আলো,
কিশোরীর কৌতুহল নিয়ে লালন করা নৈঃশব্দ,
উঠোন স্বভাব, দু'হাত ছড়িয়ে চলে লালনের গান ।
কুলপঞ্জি বাজে। ঝেড়ে ফেলি দৃষ্টিকটু ফিরে দেখা সব

কবে কোন দূষণের 'ঝুপ'। জন্মদ্বার, মৃত্যুদ্বার,
ঘুমিয়ে থাকে স্নেহজল ঘাসেদের বুকে...

মাটির ঘর
অজিত অধিকারী

আমাকে পুড়েছে মন
শূন্যতা দিয়েছে বিষ

যাবতীয় পতনের কন্ডোলেন্স সেরে
আমি আমন ধানের ক্ষেতমুখে হাঁটি

অপরূপ শুয়ে আছে নদী
পাশে বিনোদিনী, তার চায়ের দোকান

আমি ধীরে ধীরে পাশে যাই,
কিছুক্ষণ বসে থাকি, দেখি নিষ্ঠার জীবন

তারপর কিছুদূর, শহর বিরতি, তারপর
গ্রাম ও ভার্জিন মাটি
আমি মাটির জীবন নিয়ে গ্রাম অভিমুখে হাঁটি

মাটির এক আকাশ মানের যাপনচিত্র

হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

এখনও যে মাটির মানে বুঝেছি তা ঠিক জোর দিয়ে বলতে পারি না। চৌকাঠ পার হয়ে আর দূরের তালগাছটার মাঝে অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছিল আমাদের। হাঁটতে শিখতাম আমরা। সবসময় যে চোখ থাকত তা নয়। তবে পড়ে গেলে লাগত না। মাটি মানে তো পড়েছি উড়ে যাওয়া। হাঁটতে হাঁটতে বাবা পড়িয়েছে।

দুই

সন্ধে সকাল বাবা পড়া ধরতো। মাটি মানে দেখেছি একটি নদীর অবিশ্রাম বয়ে চলা। জল মাটি কিছুই চিনি না। বাবা বলতো, মানে বুঝে ফেলা কোনো যুদ্ধে জিতে যাওয়া নয়। বরং তাতে হাত পা অনেক ছোটো হয়ে আসে। মাটি ধরতে সমস্যা হয়। তুমি শুধু জলপায়ে এগিয়ে যাও সারাবেলা।

তিন

একটা গাছের কথা মনে পড়ে। তালগাছ। মাটি থেকে কিছুটা উঠে হঠাৎ বেঁকে গেছে। আমি বসে বসে পা দোলাতাম। বাবা মাঝে মাঝেই তালতলায় গিয়ে বসত। এমন কথা বলার জন্য মুখের উৎসপথে যতটুকু আলো দরকার তার থেকে একটু বেশিই আলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। দেখতাম আলোতে মাটির দানাগুলো সুঠাম অক্ষরে সরে গেছে।

চার

রোদ্দুর দুপুরে মাটি বলতে জানতাম ছাতা। মালোপাড়ার দশহাত গড়ানে গড়িয়ে পড়তে পড়তে ঠাণ্ডা মাটির ভাষা কবে যেন শিখে ফেলেছিলাম। জলপায়ে দাগ পড়লে মাটি আমাদের দুয়ার খুলে দিত। কিছুক্ষণ পরে চোখ বুজলে বাবা পড়াত ঠাণ্ডা মাটির বর্ণপরিচয়। যদিও স্পষ্ট নয় তবুও দূর নক্ষত্র দেশ পর্যন্ত চোখে ভাসতো আমাদের জন্মপরিচয়।

সাগরের গান

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

এত একা, কেন মনে হয়
আজ এই ভাগীরথী তীর ?
দু’পারে অজস্র আলো তারার মতোন,
সন্ধ্যাবেলা জানান দেয়তো রোজ
নিমাই তীর্থের ঘাট বৈদ্যবাটি জুড়ে।

নৌকা ভেসে যায় দূর,দৃষ্টির ওপার।
মধ্যযুগ মেতে থাকে চৈতন্যকথায়,
বুক বেয়ে মাথা তোলে মঙ্গল বণিক
ধনপতি -চাঁদ আরও তার কত নাম
কোথায় ভেসেছে জল
কালীদহ কূল,
অপেক্ষায় রয়ে গেছে দূর।
ন্যস্ত ব্যবধান। সুলুক সন্ধান।

কতদূর নিঃশব্দ বিশ্রাম
নদী তো শোনায় কথা,
সাগরের গান।

অমৃতকালে

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য

যেদিকে হাঁটি, রক্ত ছিটিয়ে পড়ে থাকে
রক্ত। কোথাও খয়েরী হয়ে গেছে
কোথাও থকথকে লাল।
টাটকা এবং বাসী

কারখানার দরজায় ছাঁটাই চাকরির লাশ
ফুটপাথে বন্ধ দোকানের মরদেহ
স্কুলে অসংখ্য মেধার লাশ
শৈশবের গলিত দেহ ...

পোড়া ঘাস আর স্বপ্নের ক্ষতবিক্ষত দেহ
পায়ে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছি
ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দী
পার হয়ে বিবর্ণ ন্যুব্জ
অমৃতকালে

একা একা শিশুটার মতো

অরু চট্টোপাধ্যায়

একা থাকলে শিশুটার মতো গাছ হয়ে যেতে হয়, একা পথ ঠোঁট ফুলিয়ে,
অভিমানহীন অভিমানে ভিতরে ভিতরে শেকড়ের গমনের মতো অন্ধকারে হেসে ওঠে।
একা একা মুগ্ধ হওয়া,একা একা কথাকার শব্দের বুননে, নিখিলের সবুজ পাতাটা নিয়ে,
মাটির ওপর ঝরে পড়ে, এ হৃদয় বললো কখন চুপিচুপি,
আমি দুলে উঠলাম।

পৃথিবী আমার সাথেই আছে, ঘাস পথ ঠিকানা লিখেই রেখেছে,
গাছ একা একা আলোর কলস ভরা গান জমিয়ে রেখেছে।
মাথার ওপর শূন্য কথা বলে অনন্ত আখরে।

একা একা প্রাণ পাখা নিয়ে উড়েই চলেছে, গতকাল বেদনা ছিলো,
হ্রদের জলের মতো স্তব্ধ টলমল।
অন্ধকার হাহাকার যেটুকু ছায়ায় রেখেছিলো, সেটুকু শিশুর হাতে নিহত হয়েছে।

এখন আনন্দ শিশুর পায়ের মতো জড়িয়ে গিয়েছে, অকপট একা আমি,
সীমাহীন আকাশ বিস্তারে, আহ্লাদে শূন্যতায়,
বোবা পাখা মেলে বসে আছি।

শূন্যের কবিতা
তৈমুর খান

রাস্তা খুঁজেছি শুধু, কোথাও রাস্তা আছে?
কত হৃদয় ভেসে গেল প্রেম নেই বলে
কত জ্যোৎস্না ফিকে হল, কেউ এল না আর
সমস্ত জীবন শুধু বিরহের একটি কবিতা

কয়েকটি দিন স্মৃতির বারান্দায় নেমেছে পাখি
দেখেছি তাদের ঠোঁটে মুহূর্তের আলো ওঠে জ্বলে
বিচিত্র নকশার ডানায় উড়ানের চিহ্ন লেগে আছে
কখনও কখনও চোখের কোণে দিগন্তের ভাষা

পড়তে পড়তে সম্মোহন তীব্র হয়ে গেছে
আসঙ্গ লিপ্সার হাতছানি অনুভব করে
বারবার ডেকেছি তাদের নাম ধরে
এ জগতে কোন্ পাখি বলো খাঁচা ভালোবাসে?

অনেক বৃষ্টির দিন, অনেক রোদ্দুরের দিন
একা একা ঘর-বাহির করে নিরন্তর উদ্বেগে
স্তব্ধতায় নিজেকে মেলেছি আরও গভীর স্তব্ধ হয়ে
নিজের আঙুল ধরে নিজে অপেক্ষায় থেকেছি

শূন্যের কবিতা হয়ে আজ নিরুচ্চার শব্দের কাছে
এই অনন্তে শুধুই শূন্য হয়ে গেছি, আর কিছু নয়

বিরোধ
অলোক বিশ্বাস

মৃতদেহটির সঙ্গে কথা বলে জেনেছি
তার ভেতরে এখনো জেগে আছে তৃষিত উট।
রক্তমাংসে প্রবাহিত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিরোধী
কয়েক লক্ষ স্থিতিস্থাপক অক্ষর। একদা সে-মানুষ
পাথরের স্পর্ধাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। শিখরে
পৌঁছনোর আগেই গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে।
মার্কস কিম্বা মাও-সে-তুং-এর রচনাবলী সে-মানুষ
না পড়লেও, জেনেছিলো, ছোঁয়াচে হিংসার দেশে
জলসেচ কতোটা জরুরি। মৃতদেহটি সর্বত্র মাতৃভূমির
প্রকৃত ছবি শোনাচ্ছে। চলাফেরা করছে
আগুনের বিস্ফোরণ উপেক্ষা ক'রে। জীবিতেরা
তাকে দেখে ভয় পায়। জীবিতেরা ভাবে,
মৃতদেহ তাদেরকে স্পর্শ করলে তারাও উট হয়ে যাবে।

বর্ষা
অনুপম ভট্টাচার্য

হঠাৎ করে বৃষ্টি এলে ভিজবে
নিজে খেয়াল নিজে খুশী
ঝমঝমিয়ে জল থইথই গান শুনবে
মেঘের ডাকে তখন তুমি চমক লাগা
বালিকা বেলা খেলার সাথী।
ভীষণ বেগে হাওয়ার সাথে ছুটবে
এ রাস্তা ওই গলিতে হারিয়ে যাবে
সমস্ত রাগ সুর হবে ঠিক সন্ধ্যা আলোয়
যখন তোমার চোখের ওপর আমার
এ দু চোখ।

বোরখা

অরূপ চন্দ্র

অপরূপ প্রকৃতি কোথায় হারিয়ে গেছে
মেঘের আড়ালে চাঁদ
জ্যোৎস্নার অভাবে আমিও ছায়া-ম্লান
অন্ধকার ঢেকেছে সব আলো
কাঠকয়লার নিচে গনগনে শিখা
কৃষ্ণসাগরে রূপালি শস্য

এই অন্ধকার তোমাকে মানায় না
কোথায় প্রিয় নারী
তোমার মায়াবী কাজল চোখ
চকিত চঞ্চল তৃষ্ণার্ত অধর
মধ্যযুগের গর্জনে গুপ্ত গহ্বরে উঁকি মারে

অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে তুলে নাও আয়ুধ
শাস্ত্রীয় পোষাকে দাঁড়াও সম্মুখে
গান গেয়ে উঠুক পাহাড় সমুদ্র স্মরণ্য নদী
তোমার অপরূপ রূপের উদ্ভাসে —

হ্যালুসিনেশান

আফজল আলি

খোলা চুল বিষয়ে কবিতা লিখতে
কালো ক্লিপের কথা কেন আসছে জানি না
দূরে কি কোথাও মৌমাছি উড়ছে
নাকি ভ্রমর এসে বসছে গালে
এমনটা হবার কথা নয় আমি লেক গার্ডেনে বসে আছি
কিংবা ফতেপুর সিক্রিতে
অতীত আর ভবিষ্যত এ দুইয়ের মাঝে
বর্তমান কখন টুক করে চলে যায়
আমাদের কিছু করার-ই থাকে না
তখন হাতে সিগারেট নিয়ে জুঁইফুলের মালা
পরতে ইচ্ছে করে
পরস্পর বিরোধী দুটো কথা কীভাবে লিখলাম
ক্রমশ কি হ্যালুসিনেশান রোগে আক্রান্ত হচ্ছি
সিরিয়াস একটি বিষয় লিখতে গিয়ে
unserious হয়ে যাওয়া
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ নিয়ে খুব বেশি
আলোচনা হয় না এখন
কারণ ওখানে ঘটনা কম , যত হৈ চৈ মিডল ইস্টে,
অধুনা ইউক্রেন

স্পোক্সম্যান

রেজাউদ্দিন স্টালিন

যে সব দরোজা নিজেদের খুলে রাখার অধিকার চায় তাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দাও
তাদের সন্তান জানালা আর ভেন্টিলেটর ভাইবোনদের
সীমাহীন রাতজুড়ে জ্বালিয়ে দাও
তাদের স্ত্রী চৌকাঠদের এক কোপে বিচ্ছিন্ন করো
আর তাদের গৃহপালিতগুলো দাও গিলোটিনে
কিন্তু কারো গোলামী আর দাসত্বকে স্পর্শ করো না

সমাজপতি আর পোষা কবিরা তাদের
মহিমাকীর্তন করবে
মুহুর্মুহু বিবৃতি দেবে বুদ্ধিজীবীরা
রাষ্ট্র তাদের বিভূষিত করবে তকমায়

দরোজাকে দোষী বলবে আদালত

একজন গলাকাটা দরোজা উন্মুক্ত হতে পারে না
মুণ্ডুহীন পোষা বিড়াল মিউ মিউ ডাকতে অপারগ

বুদ্ধিজীবী আর স্পোক্সম্যানরা পাবে
আমৃত্যু ভাতা বাগানবাড়ি এমনকি
স্বর্গের সার্টিফিকেট

অধিকার চেয়ে আন্দোলন করেছিলো
যে বাড়িঘর-দরোজা-জানালা
তাদের কোনো স্পোক্সম্যান নেই

তারা চিরদিন হাঁটতে থাকবে
প্রোমিজ ল্যান্ড ইতিহাসের দিকে

পাঠমগ্ন-ঋষি
রওশন রুবী

আমাদের দেখা হওয়ার দরকার ছিল
আমাকে আপনার কড়ে আঙুল থেকে
খুলে নিতে হতো রেণুর মতন দুঃখবোধ
পারিনি বলেই সীমাহীন আর্তনাদ ভেতরে ভেতরে
বুদবুদ তুলে নদী তারপর বঙ্গোপসাগর সিন্ধু হয়ে সমুদ্র
যেতে যেতে শেকড় বাকল পত্রপল্লবে —
লিখেছে যা সেই ইতিহাস দূর্বাও জানে
উপত্যকা খুঁটে খুঁজেছি বন্ধুর মাটির দেহ — পাইনি,
জোছনা ভেজা রাত নিভে গেলে যে মদির আলো
তাতে খুঁজেছি এক ভক্তের উড়াল কথন — পাইনি
তাঁতালো রোদের চাতালে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি — পাইনি
অথচ আপনি নাকি পাঠমগ্ন-ঋষি
কোনোদিন দেখাই হলো না
তীর্যক আলোর বন্যার মতন নির্মলতাকে
আমি হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টান কী মুসলিম জানি না
মানুষের অবয়বে মানুষের গহীন ডাক শুনতে
বাকলাদ্বীপ মহেঞ্জোদারো হরিকেল সমতট
আর সব সভ্যতা ছুঁয়েছি
এক পসলা মানবিক অনুভবে ভিজতে
পদ্ম ছুঁয়ে দেখেছি
কখনও কখনও চন্দন ছুঁয়ে দেখেছি
যা হারায় একেবারেই হারায়
সেই থেকে যা ফিরে সে শুধু ভ্রম
সে শুধু আফসোস
যা আকাঙ্ক্ষা তা তুষের আগুন জেনেছি

সোজা নয় ফেরানো
অভিজিৎ রায়

রাত করে বাড়ি ফেরা ভোরের গোধূলি জানে
অবিন্যস্ত ঘরে তার
মেঝেতে ছড়ানো আন্ডারওয়্যার,
খাবার টেবিলে এঁটো বাসনের
ডিভোর্সি সংসার,
খোলা বারান্দায় কাকভেজা পাঞ্জাবি ও পায়জামা,
দু'জোড়া মোজা।

যে ঘর গিয়েছ ছেড়ে
বুঝে গেছি
সেই ঘরে তোমাকে ফেরানো
সোজা নয়, নয় এতো সোজা।

স্ট্রিং-কোয়ার্টেট
শ্যামশ্রী রায় কর্মকার

সঠিক সময় বুঝে উবে যেতে হয়
পাতার পতনশব্দে যেতে হয়, এমন অস্ফুট
প্রথম বলার আগে যেমনটি স্ট্রিং-কোয়ার্টেট
বেজে ওঠে, আর তুমি ধরতে পার না
তার কতটুকু চেলো, কতটা বেহালা

পাইন গাছের নিচে পেতে দেওয়া আলো
অপাপবিদ্ধ ফার্ন, হাওয়ার অক্টেভ
ধ্বনি-পাখি, চুপ-পাখি, হারানো কবিতা
ঋত-অভিলাষী মাটি, ব্যথাতুর ছায়া
সারাটি দিন এই নিয়ে তর্ক করুক
তুমি ঈশ্বর না শয়তান

গাছ যখন প্রেমিক
দেবাশিস সাহা

শ্মশান থেকে ফেরার সময়
সঙ্গ নিলো একটি
বারোয়ারি শিউলি

তোমার ডাকনাম উচ্চারণ করলেই
গাছের সে কি হাসি

গাছতলা ভরে যায়
হাসির টুকরোতে

সে কখনো ছেড়ে দেয়নি হাত
রাত-বিরেত
সুযোগ পেলেই
গন্ধে ভেজায় চুল

ভুল তপস্যার রুদ্রাক্ষ
বিশ্বজিৎ মণ্ডল

১
এইতো সাজিয়েছি — তপস্যা.....

এখানে অবিরত আসে উজবুক জোনাকির দল
নিভে যাওয়া চন্দন বল ছেড়ে, উড়ে যায়
পরম্পরার
কাগজে পাখি

আমি তো দলছুট সেই ব্রহ্মশিষ্য
আশ্রমের জল তর্পন এর নামে বহুবার
সাজিয়েছি ভুল মন্ত্রের উচ্চারণ

২
তপস্যা দীর্ঘ হলে ধুয়ে যায়, বল্মীক শরীর
ছোট হতে হতে জীবন ছেড়ে আকাশের
পালিত মেঘ

এই তো সেই রুদ্রাক্ষ.....
উদাত্ত তর্জনীতে মেপে চলি, আমাদের
ইহকালের অধ্যয়ন

উপাসনা

হাসি খাতুন

কোনবারই শীতকাল বিমূর্ত হয়নি আমাদের।
ভেতরেও কুয়াশাঘন শাসন, অবাধ্য ছেঁড়া উল
নৌকো বাওয়া এসব দিনেই বন্ধ হয়

তখনই বাবা গল্প বলে।

মাটির ওপর অসম রূপকথা
হাওয়ার হিংস্র লড়াইয়ে নেমে
জাতকের দল

আমরা শুনি কি শুনি না মা ঠিক বুঝতে পারে।
উত্তরণের ও মায়াপথ আসলেই কোথাও ছিল না।
বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে মা বলে
কাল কিন্তু ঠিক চাঁদ উঠবে
জন্মদিনের পায়েস রেখে যাবে কেউ

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি বারবার।
কুয়াশার চাষবাস, তুমুল পাথর
মৃত পাখি পড়ে থাকে

এভাবেই স্থবির
মহার্ঘ ঈশ্বর পর্যন্ত উপাসনার রাস্তা গড়তে
সপ্তাহান্তের দিনটিকে
আমরা এখন বাবার পাশ থেকে টেনে তুলি

পথিক

নিখিলকুমার সরকার

পথিক বিলুপ্ত ...
তার নিস্পন্দ ছায়া পথ-শরীরে স্পষ্ট দৃশ্যমান

ছায়াটি মুছে দিতে দিতে চির-কামনাতাড়িত পথ ক্রমশ
নতুন পথিকের খোঁজে অচেনা বাঁকের রহস্যময়তায়
নিঃসংকোচে উঁকি দিচ্ছে ওই ...

পথিক নিছক পথিকসর্বস্ব নয়
বিচিত্র শৃঙ্গারে পারঙ্গম কবিতা-নিঃসৃত শরীরও বটে

পাতাঝরা দিনের মতো এইসব অস্থিরতা

সৈয়দ সাখাওয়াৎ

গভীর আঁধার থেকে উঠে আসি – ঘুম থেকে জাগরণের মতো – কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকি তোমার দিকে দ্যাখি, কে যেন আমার শরীরে হেঁটে বেড়ায় অন্ধকার থেকে আলোর উৎসমুখে, যেন এক দীর্ঘ যাত্রা। এ'যাত্রা শেষ হয় না মেহেরুন! শহরে এখন মোমবাতির আলোর মতো — বিচ্ছিন্নতা। চোখ বন্ধ করতেও ভয় হয়। আমি মুখের দিকে দ্যাখি — সবগুলো একই মুখ — হাসছে, কাসছে — থু করে ছিটিয়ে দ্যায় থু থু। চায়ে চুমুক দ্যায় — ধোঁয়া টানতে টানতে — ঝাঁকুনি দিয়ে ছাই ফেলে। হোটেল ব্যবসায়ীরা মিটিং করে, বাজার কমিটি মিটিং করে, রাষ্ট্রপক্ষ মিটিং করে, জাতিসংঘ মিটিং করে — কোথাও নেই একটু স্থিরতা। আমার কেবল স্থির জলে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়।
দীর্ঘ শ্বাস নিই। এইসব পাতা পুড়ে যাওয়া দিনে জলের বড় হাহাকার। আরশোলাদের মতো দিকে দিকে ছুটি। মানুষের চিৎকার শুনি — খিস্তি-খেউড় — রাজা-উজির মেরে ফেলার গল্প। আমার কেবল শোকের মতো হাসি পায়। টিভি নিউজ দ্যাখি — বিবিসি, সিএনএন, সরকারি-বেসরকারি চ্যানেল; মাংস পুড়ে যাবার গন্ধ পাই।গণ কবরের মতো অশ্লীল মনে হয় সবকিছু!

তোমার কথা অমৃত সমান

(নাট্যব্যক্তিত্ব শাঁওলি মিত্র স্মরণে)

সাধন কুমার রক্ষিত

এখনো তোমার কথা মনের মধ্যে
দুধের সরের মতো ভাসে।
কত ভুল আধো-অন্ধকারে জমে আছে
ভাঙা জানালার কাঁচে
তথাগত হাওয়া ধুয়ে দেয় দাহপত্রগুলি
করুণার মতো রোদ পিঠে এসে পড়ে;
অগোছালো কিছু ভালোবাসা, কিছু ঘুম, ঘুমপাড়ানি গান
বৃষ্টি-বিষাদ,পিছুটান শরীরের সীমা ছেড়ে
ঋজু হয়ে দাঁড়ায় একাকী।
বেড়া-দেওয়া কিছু পাপ
ছোটবেলার কিছু নিখুঁত তিক্ত সত্যিকথা
মধুর বিকেল বা ভিখেরি সন্ধ্যেবেলা মোহনা ছুঁতে চায়।
আমি কী এ সময়
বদলে নেব আমার কণ্ঠপ্রিয়তা, না-মানুষের ভাষা?
তুমি আঙুল ছেড়ে চলে গেলেও
আমি ফিরে যাবো তোমার কথায়, তোমার মিত্রভূমিতে
সমস্ত ত্যাগের পরে জেগে আছে তোমার স্বদেশ —
শুদ্ধতম লাবণ্যের কণ্ঠস্বর,
রাখা আছে তোমার দেহাতীত ত্রাণ;

তাই তোমার কথা আমার কাছে অমৃত সমান!

পরী ও দেবতা

রাজন গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যুর দেবতা এসে আমার পরীকে নিয়ে যায়
রথে চড়ে সে আসে — বাবরি চুল ওড়ে হাওয়ায়
শিস দিয়ে ডাকে
পরী নাচতে নাচতে উঠে বসে রথে
আমি চেয়ে থাকি — সে চলে যায়; বাতাসে
কাঁপে তার মৃদু দুলে যাওয়া হাত
বজ্ররাঙা রথে দেবতা তাকে নিয়ে উড়ে যায়
সুউচ্চ পাহাড়ের শীর্ষে গিয়ে থামে অবশেষে
তারপর তার উষ্ণ ঠোঁট নেমে আসে
বরফে গলে যাওয়া চাঁদের ভিতরে
দেবতা ও পরী, পরী ও দেবতার খেলায়
পৃথিবী অন্ধ হয়ে যায়।

নদী মানুষ ও বৃক্ষের কথা

সুশান্ত বিশ্বাস

সীমানা সুতোই বেঁধে আছো মাঝি,
আমি যেতে পারি যতদূর বল —
পাখিদের জিজ্ঞেস করো,
বাতাসের মতোই তারা অবাধ।
শুধু আমার দু'পারে পাড় ভাঙা বিষাদে
দাঁড়িয়ে একাকী বসত ভুমি।

হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা বাড়ির উঠোন
ঘরের মেঝের আচরণ,
শিল্পীর তুলিতে আঁকা প্রেম
মেঘ রং হয়ে ঝরে পড়ে,
তুমি একাকী বন পালিতা, হেসে ওঠো।

একজন পথিক বৃক্ষের কাছে
সগর্বে নিবেদন সেরে উঠে দাঁড়ালে
দু'হাত তুলে বৃক্ষ বলল, মানুষ হও।

গানের অন্তর
নীলিমা সাহা

অনর্থক অপেক্ষা তাকিয়ে থাকে

বিরহ-চিহ্নে সাজানো দিনগুলো
কবেই তো জেনেছে তোমার আকাশের তারা হয়ে
ফুটে থাকার কথা — যেখানে আছে স্বাতী বিশাখা
চিত্রা শতভিষারা

দিবাস্বপ্নে নিরর্থক ভেসে ওঠো আর উদাস অপেক্ষা
নগ্ন হতে থাকে

গলনাঙ্কে দেখি গণিতের বিণীত চোখ নিত্য পাঠ করে
রুলটানা পাতায় আঁকা তোমারই হাতলিপি, রতিশব্দেরা
যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি অন্য কোনও পিপাসার
অসমাপ্ত গানের অন্তরাও সম্ভোগে পৌঁছোতে পারেনি আর

সেই অতীতাচারী রোদ...
এখনও পা-পাতার জল জল বোধ, বুঝি বা
তোমারই রেখে যাওয়া দাগ

প্রিয়দিন ভেসে যায় দূরে

কৌশিক বড়াল

কাতারে কাতারে ভিড় কান্না ঘামে কাদামাখা মগজ
সুরের পরশে অন্তরে অঘোর বৃষ্টিপাত রাত্রির ডানায়
নির্মোক ক্রান্তিকাল জেগে ওঠে উষ্ণ প্রস্রবণ শকুনিপাশায়
মোহ সব কাটাকুটি খেলে কনে দেখা আলোর বন্যায়
গাছেরা আকাশের সাথে কথা বলে বাতিঘরে সামুদ্রিক
ঢেউ এসে চামর দোলায় বাতাসে ভাসে শিউলির
ঘ্রাণ সম্পর্কের বাসমতী চাতালে দিনান্তের টানাপোড়েন
ঘরজুড়ে খেলা করে প্রগাঢ় কালো অন্ধকার বুকের
মাঝে এলোকেশী সোহাগ পরিচিত রাত মুছে দেয়
বিচলিত সীমানা রোদে পোড়ে মেঘের সময় প্রিয়দিন
ভেসে যায় দূরে

প্রতিজ্ঞা

মহম্মদ সামিম

আদিগন্ত তোলপাড় শেষ।
নিভে গেছে বুকের ভিতরের বিষাদমিহির
পড়ে রইল যজ্ঞ শেষের আগুন, তুষের দহন
দু-একটি মৃত জোনাকি ও খড়কুটো...
মাঘের ভোরের মতো শ্বেতাভ চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে সময়
নিঃস্ব পথকে কী দেবে জীবন?
বহতা নদীকে দেখি, ভাসিয়ে নিয়ে যায়
পৃথিবীর প্রতিটি হেরে যাওয়া মানুষের ঘ্রাণ

বাসা ভেঙে দু'জন, গন্তব্য ঠিক করে নিয়েছি।
যে যার চোখের জলে মিশে গিয়ে, অশ্রু দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি সীমানা
ব্যথারা অক্ষর হয়ে সাঁতার কাটুক
কেউ কারোর কাছে ফিরব না কোনওদিন
গোধূলির নীরবতা দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছি ছায়ার সেতু।

নেরোল্যাক বনাম ঘরপোড়া গন্ধ

এলা বসু

শৈশব ঘুমিয়ে পড়ছে
খুব ক্লান্ত সে এখন
এত এত পথ একলা হেঁটেছে
আঃ নেরোল্যাক নেরোল্যাক!
কি আমেজ এই গন্ধের
রঙ হচ্ছে আমার নতুন বাড়ির
আজ বাদে কাল গৃহপ্রবেশ
পিছন ফিরলেই নেড়াপোড়ার ধোঁয়া
পুড়ে যাচ্ছে কোলে পাড়ার বাড়ি
রুনা পিসি, কাশি দা, দারোগা কাকু
সবাই বালতি বালতি জল ঢালছে
থামছে না আগুন। আমি জানি।
থামবে না আজ সারাদিন। অভিমান!
মা বাবার ভস্ম নিয়েছি এই কঠিন হাতে
তোমার ও নেব হে প্রিয় আশ্রয়
দাঁড়াও আসছি...

ঈশ্বরী- ১৮

সুমন দিন্ডা

প্রতিবার আত্মসমর্পণের পর তুমি মেধাবী হয়ে ওঠো। খোলা জানালা আর বন্ধ দরজা সেকথা জেনেও মুখ ফিরিয়ে থাকে। রক্ত ঝরে বাইরে আবার ভেতরেও, চুপচাপ সহ্য করে যাও। লুকিয়ে ফেলা পোড়া দাগও অবাক হয় তোমার স্পর্শে। কীভাবে যে সর্বংসহা হয়ে ফসল ফলাও, কীভাবে সঠিক পরিচর্যায় সারিয়ে তোলো সবার ক্ষত-- জাস্ট অবাক হতে হয়। অথচ এমন ওষধিও অবহেলায় বেড়ে চলে। স্বাভাবিক অনাদর গায়ে মেখে যে পূরণ করে সকল শূন্যস্থান, তাকে দেবী বলার স্পর্ধা ক'জনের আছে?

আরবীয় প্রোটোজেনিক মাছ ও রূপান্তরিত কঙ্কালের প্রস্থচ্ছেদ
নিমাই জানা

সাদা আরবীয় প্রোটোজেনিক মন্থরা পাখিরা উত্তরায় উড়ে যাওয়ার পর মরীচিকার নীল অলৌকিক পুরুষেরা বালিদানার ভেতর থেকে রক্ত রসের ৬৪টি ব্রহ্মক্ষেত্র আবিষ্কার করে নেয় জীবিত কঙ্কালের প্রস্থচ্ছেদ করে, মাছের তলপেট থেকে ধূসর রঙের ডিম গুলো বেরিয়ে আসছে রূপান্তরিত নৌকো বহরের সৈনিক সেজে

আমার দুটো হাত নেই অথচ রাতের হাইড্রেনের ভেতরে ডুবে থাকা সোনালী মাছেদের রোঁয়া ওঠা শুক্রাণুগুলিকে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে সাদা পাউডারের ভেতর লুকিয়ে রাখি আত্মহত্যার জন্য, রাতের ত্রিপাঠী ডাক্তারটি ঘুম ঘোরে নরমাল স্যালাইনের পাঁজরহীন পাখিগুলোকে নিয়ে একা একা শৈল প্রদেশের দিকে চলে যায়, মাথার উপর দিয়ে যে মেঘগুলো ভেসে যায় তাদের কোন কার্সিনোমা আক্রান্ত শিরদাঁড়ার বায়োপসি বিষয়ক চাকা নেই

নীলাভ দাহপত্রের নাশপাতি ফলের মতো রোগাক্রান্ত চুল্লীর ভেতরের অসিদ্ধ পুরুষ বেরিয়ে আসলেই আমার জিভের প্যারাফেন মেশানো নৌকাগুলো বিষধর হয়, তামাটে আগুনের খোলশ চোখে ঘন রাতের আর্তনাদ শোনায় তিন মুদ্রার জীবিত কঙ্কালদের বাটিক প্রিন্ট পোশাক ঢেকে

মাল্টি মিনারেলস সংকীর্তনিয়ারাই কেবল নৌকার গর্ভপাত কথা জানে না, ঝিনুক ঈশ্বরীরা জ্যোতিচিহ্নের স্বরবর্ণগুলোও সাদা ফসফরাসের ভেতরে ঢুকিয়ে আচমন করে দিচ্ছে তৃতীয় প্রকোষ্ঠ, বুকের নপুংসক অসুখে ভোগা হৃদপিণ্ড, আর রেচনতন্ত্রের পাখিগুলোর দহন পরবর্তী শ্মশানের শ্যামকুন্ডু রতিযজ্ঞের পুরোহিত সেজে, আগ্নেয় অসুখের যোজ্যতা নির্ণয় করছি আজ

আবাদকথা

হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেঙেচুরে কে ছড়ালো মধুর আতর!
চারিদিকে ঘনঘোর বৃষ্টি থই থই
ভীষণ উষ্ণতায় পুড়ে যাওয়া কমলীর
দীঘি পুনরায় সবুজমুখো।
মাঠঘাট,পুকুরপাড়, তেমাথায় অশ্বত্থ
প্রবাদপ্রতিম গদগদ বুক নিয়ে
পথিকপ্রত্যাশী, সে জানে অতীতে অসংখ্য
চোখ তার কাছে নুইয়েছিল মাথা, জুড়িয়েছিল
পুড়ে যাওয়া ব্যথা।
ভেঙেচুরে কে জড়ালো অল্পঅতীত!
শ্যাওলার কাছে এসে আজও বারবার নিঃস্ব
হয় মিথ ও সম্বিৎ।
বৃষ্টি পড়ে,
পাতা নড়ে,
একবুক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রবৃত্তি
মেঘেমেঘে প্রবাদের-আবাদের,
লুকোচুরি খেলে,
জন্ম-ছলকায়...
স্বপ্ন ছলকায়...
ঝমঝম শব্দে পৃথিবীতে জীবনের জড়তা
ভেঙে গেলে, শুরু হয় জন্ম-
কোলাকুলি,জীবনের বাকি স্থপতি
কলতান...

সাগরসঙ্গম

গোপাল বাইন

ভিতরে নদী আছে
স্রোত আছে এদিক-ওদিক
নৌকা চলে এলোমেলো
কূল-ঘাট কিছুই চেনে না।

ভিতরে এক মাঝি আছে
দাঁড় সে জানে না বাইতে
হালও ধরে না
শুধু পাল তুলে বসে আছে।

পাল তুলে নিশ্চিন্ত সে মাঝি
গান গায় মনখোলা সুরে
নদীও ধরেছে গান
সাগরসঙ্গম।

সমুদ্রের ডাক

সুরঞ্জন রায়

সকাল ছাপিয়ে রোদ উপচে পড়ে
অমৃতের মায়া-ভাণ্ড জুড়ে
অশেষ কৃপার ওম্ ছড়িয়েছে মৃত পৃথিবীতে...

ছিন্ন-ভিন্ন মুহূর্তের দাগ চোখের পাতায় জাগে
কত কত ধর্মের সোহাগ মাখা গুপ্ত অনুরাগ
ডানা মেলছে নমস্কার-সুপ্রভাত-ধন্যবাদ-ভোর
একা একা পুরনো দুঃখের রং পানের পাতার মতো
ভিতরে ভিতরে লালে লাল...

দুপুর অপেক্ষ-মান বিকেলের লাজুক আগুন
তোমাকে ক্রমশ ঘিরে ধরেছে আকুল আবিলতা
অথচ সহজ কোনও সুতোর আড়াল
প্রতিবার আটকে দেয় বাউলের মতো ঘর ছাড়া
তুমুল সাহস মায়াবাদী...

ছিঁড়ে যাও সমস্ত নোঙর ভীরু তরী
শুধুমাত্র সমুদ্রের ডাক গায়ে মেখে পাড়ি দাও
অসীম অকূল ঢেউ তোমার পাখনায় বেঁচে থাক
জটিল-জীবন ছায়া অফুরন্ত রোগের ফসল...

যক্ষপুরী

সোমনাথ বেনিয়া

ডুব দাও, অতল নিয়ে ভেবে কী হবে
অবৈধ শূন্যতায় যে চোখ দেখে তার
উপত্যকায় বুনোফুল ফোটে
নিজেকে সামলে বড়োজোর ভাবতে পারো
ঠিক-বেঠিকের রূপকথা
সোনাপাতার সকালে সবুজ শুঁয়োপোকার
হামাগুড়ি, কিছু ইত্যাদি
খুলে দাও খোঁপা, অন্ধকার যক্ষপুরী থেকে
নেমে আসুক বিলাপ
সমস্ত রাজকীয় সংলাপ, পদতলে নির্মাণের
সূত্র
শরীর থেকে সরিয়ে ফেলো রিজার্ভেশনের প্রিয়
ঘুমের খোলস
দূরে সরাও জ্যোৎস্নার শহর, অস্থায়ী তাবুর
কৌতূহল
ক্ষত থেকে ঝরে পড়ছে অচেনা
পর্যায়সারণীর ধাতব মৌল
কাকস্নান করে উঠে তোর্সার গন্ধে বিভোর
থাকো মন ...

অভিমান

নির্ঝর চট্টোপাধ্যায়

অভিমান হয়েছে অভিমান
এবার যাবো,
দাঁড়াও তুমি ‘কনক’

ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে
তোমার জন্য চুড়ি-আয়না-টিপ
সব নিয়েছি!
আর একটু, সবুর করো,

কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই
বলেছিলাম বসন্তে যাবো,
হয়নি
তবে
হেমন্তে দেখো, যাবো,

ঝড়ের বেগে যাবো
এবার ভাঙবো তোমার,
অনন্তকালের — অভিমান।

ইংরেজ কবি Christina Rossetti-র লেখা LET ME GO
কবিতার ভাবানুবাদ

আমায় যেতে দাও

সৌমেন রায়চৌধুরী

যখন আমি রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছব
সূর্য তখন যাবে অস্তাচলে
আমি চাইনা কোন বিষাদমাখা কক্ষে
তোমরা কোন স্মরণসভা কর,
আত্মার মুক্তিতে কেন কাঁদবে?
আমার অভাব কিছুক্ষণের জন্য অনুভব কর,
কিন্তু দীর্ঘ সময় সময় নয়
সুদীর্ঘ সময় যে ভালবাসা আমাদের মধ্যে
বিনিময় হয়েছে তা স্মরণ কর,
কিন্তু আমায় যেতে দাও।
মর্ত্যে কিছুদিন দিনযাপন,
তারপর একাকী ফেরা
এ সবই তাঁর খেলা
মুক্তির পথে একটি পদক্ষেপ।
যদি নিঃসঙ্গতা অনুভব কর, হৃদয়ে ব্যথা অনুভব কর
বন্ধুদের কাছে যাও
আমাদের অতীত ঘটনাবলী স্মরণ কর
আমার জন্য একটু হলেও অভাব অনুভব কর
কিন্তু আমায় যেতে দাও।

বিজয়প্রীতি

জীবনকুমার সরকার

মনে হয় ডুমদী থেকে ডেকে আনি
বিজয় সরকার, তোমাকে
আমাদের অসহায়তা বোঝাই
তুমিই তো আমাদের প্রকৃত পড়শি
লোকায়ত বাংলার সমাবেশ।

তুমি ছিলে জাতিভেদের মুখে ছাই
পাগল বিজয়, তোমার গানের আগুনে
আমি জ্বালাবো গ্রাম, শহর, নগর
পোড়াবো দেশান্তরিত হৃদয়

ডুমদীর মাটি, খেত, মাঠ, নদী, গাছপালা
সবকিছু নিয়ে ফিরে এসো পাগল বিজয়
আমাদের দরিদ্র কুটিরে।

এপারে শত শত নক্ষত্র জেগেছে আকাশে
মাঠে মাঠে উড়ছে লোকায়ত যুদ্ধ —
ওপারের আকাশেও দেখছি সূর্যের আলো
মাঠে মাঠে তোমার গান ফসল ফলাবে একদিন
সেই যুদ্ধে আমাদের পোষা পাখিও আছে সঙ্গে।

তোমার পোষা পাখি উড়ে গেলেও
তুমি উড়ে যেতে পারো না।

ওগো পরানপ্রিয় কবিয়াল, খবর নিও দিনের শেষে।

বুকের ধন
সহিদুল ইসলাম

বিপন্ন আঁধার এক বুক, চাপড়ায় চাঁদ মুখের হাসি,
অবিরত লজ্জাহীন দম্ভে পোষ মানালে কদাচার;
'মেয়ে বাঁচাও - মেয়ে পড়াও' অলীক কথার কুসুম
সোনার মেয়ে, কপালে এঁকে দিয়েছে সোনার টিপ।

রক্ত কণায় মুদ্রা দোষ, নাচাও শয়তানের আবেশ
মুখ ঢাকো লজ্জা; চোখের তারায় কাঁপে স্বদেশ।

প্রিয়জন ফুঁসছে, কিষাণ মা বাবার হাহাকার
আমাদের মেয়েরা আজ মেঘের মতো কাঁদছে,
আমাদের মেয়েরা আজ মোমের মতো জ্বলছে,
আমাদের বুকের ধন তেরঙা হাতে পাথর।

তখনও তোমার মগ্ন চোখে আগুনের বৃষ্টি
তখনও তোমাদের নখরে কুটিকুটি স্বদেশের মাটি।

নিখোঁজ
বন্যা ব্যানার্জী

সুগন্ধী আতর ছড়িয়ে চলে গেলো কাচ ঢাকা গাড়িটা।
হাওয়া বয়ে ফেরে শুকনো কিছু খই
মৃত্যুর পর সবার শিরোনামই বডি।
এমনি করেই মুছে যায় পুরনো সব জোনাকির মাঠ।
যেমন করে মুছে গিয়েছিল ফার্স্ট ইয়ারের প্রান্তিক! শস্যের সাক্ষাৎ চেয়ে সাঁকোটা আঁকড়ে ধরার বৃথা চেষ্টায়।
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে মোমবাতি মিছিলে হেঁটে চলেছে যৌথ খামারের স্বপ্ন।
যদিও রেনকোট পরা বহু লাশ আজও সনাক্ত করা যায়নি।

অগস্ত্য যাত্রা

পিনাকী রায় (কনিষ্ক)

একটা সিজোফ্রেনিক রাত
দলবলসহ ভষ্মীভূত হয়ে যায়

চুইয়ে পড়ছিল ব্লুব্লাড
ধাতব জরায়ু থেকে ঘাম
হোয়াইট কলার বেয়ে রক্তের মোচ্ছব,
অনশনকারীদের পেট ভর্তি সত্যাগ্রহ
বাতাসের অভিমানী আর্দ্রতা হিংস্র বিস্ফোরণ গুলোকে ইসোফেগাসে

ওরা সব খাবার বুফেতে রেখেছিল
১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর জীবনকে প্রলম্বিত করে চলে
চিহ্নিত ডিমেনশিয়া ইনসম্নিয়ার হাত ধরে গণতন্ত্র খুঁজে চলেছে
বছর কয়েক আগেও অলিগলি থেকে ষান্মাসিক বিলিয়ে দিত

একটা সিজোফ্রেনিক রাত
দলবলসহ আর ফেরেনি
ওরা কি গণতন্ত্র পেয়েছিল?
হয়তো বিন্ধ্য পর্বত জানে।

মমতাজ

রুদ্রদেব চক্রবর্তী

অবিবাহিত চাঁদের মগ্ন জ্যোৎস্নায়
তাজমহলের বুলন্দ দরজায় নতজানু শাহজাহান
মমতাজের ত্রস্ত আঁচলে মিলনের আর্তি
শ্বেত মার্বেলের খাঁজে খাঁজে ঝরে পরে!
অতৃপ্ত বাসনায় মমতাজ কাঁদে
তাজমহলের খিলানে ঝরে পরে অশ্রুজল
শাহজাহানের বে-আব্রু আকাঙ্ক্ষা বাঁচে
সমাধিপরে নির্জন রাতের অন্ধকারে।

তর্জনী

সুব্রত পাল

চারপাশে সর্বদা শত শত তর্জনী উঠেই আছে।
তর্জনী বড় অহং-এর আঙুল
অনবরত এত তর্জনী তোলা কি ঠিক?
আর এত তর্জনী তুলতে একটা সময় আঙুল বাঁকিয়ে
ঘি তোলার প্রয়োজন পড়লে তখন?
প্রবাদে যাই-ই থাক, এখন অবশ্য চামচার অভাব নেই।

আরে আরে আমার দিকেও তর্জনী?
ছ্যা ছ্যা এতো মশা মারতে কামান দাগা!
আমি নিরীহ প্রাণী, খুব ছোট — যত ছোট হওয়া সম্ভব
সাধারণও নই, অতি সাধারণ — কোন ডেজিগনেশন নেই,
নেই বিশাল ডিগ্রির স্ট্যাম্প সুতরাং
নেই নির্দিষ্ট কোন আসন শাসন, তর্জনী তুলে
হাতে গরম বক্তব্যের অবকাশ ...

আদতে তোলা তর্জনী আর অঙ্গুলী হেলানোর
দর্শক দরকার। এই অধম আমি পয়লা নম্বর দর্শক
এখন জেগে জেগে, জেগে ঘুমিয়ে
যে দিকে তাকাই খালি তোলা তর্জনী দেখি।

স্মৃতি

সুপ্রীতি বিশ্বাস

আমি যত দূরেই যাই
চলন্ত ট্রেনে রুক্ষ শুষ্কতা লু-হাওয়া
জানান দিয়ে গেল একরাশ তিক্ততা
ক্রমশঃ ছড়িয়ে যায় দূরে... অনেক দূরে

শরীর ভেঙে ক্লান্তি নামে
ক্লান্তি নামে রাজগীরের পাথরে — ক্যাকটাসে

পাথর বেয়ে বয়ে তোমার ভালোবাসা
আজ বিকশিত
বিশাল মহীরুহে সবটুকু চেতনাকে ছুঁয়ে থাকে
নির্জন মুহূর্তে গা শিরশিরে অনুভূতিতে
পাথরের গুহায়

পাথুরে মন বড় নিঃসঙ্গ
একাকী তোমার বোধিলাভের প্রয়াস
ত্যাগের স্মৃতিসৌধ গড়ে
চির স্নিগ্ধতায় ভেসে যাই আমি
যত দূরেই থাকি।

একটা ডিলিট

গোপাল বসাক

বেঁচে থাকলে পাওয়া যায় অপরিহার্য আহার
জীবন্ত সুখ, নিত্য গঞ্জনা
মৃত্যু! হারায় সবকিছু

দীঘল স্মৃতিরও মৃত্যু ঘটে দিনে-দিনে
চলমান ব্যস্ততার পথে ...

জমানো অর্থ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি
হাতবদলে নতুন নামকরণ পায়।
ভালোবাসার পরিচর্যা হয়
দেওয়া-নেওয়ার লেনদেনে
এই গতিশীল জীবনে, একটা ডিলিট
মুছে যাবে স-ব।

কীটের জীবন

রুদ্রপলাশ মণ্ডল

আপন আপন গন্ধ নাকের ভেতর দিয়ে মাথায় পৌঁছালে
সামনের খোলা বই তার অক্ষর হারিয়ে সাদা পাতার সরণী ধরে;
ভূগোলের ইতিহাস পালটাতে পালটাতে শুরু হয়ে যায়
বাংলা ক্লাসের পূর্বানুরাগ; অথচ রসায়নের
একটি জটিল ইকুয়েশনের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আলোয়
হাঁটা চলতেই থাকে বেশ কিছুটা সময় ধরে

প্রতিটি পর্ব ছুঁয়েই একদিন জেগে ওঠে মাথুরের লোনা জল আর
গরম লাভার স্রোত চিরে দিয়ে যায় নরম মাটির বুক

এবার অঙ্কের ক্লাস! অন্যরকম ইকুয়েশন

অথচ
একদিন যে তামাক পাতার বিকেল
জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে রোদ
আর মজা নদীর মোহনা জড়িয়ে ধরবে পানা
এটুকু তো জানা চাই
তা না হলে
অজস্র দামের মধ্যে হেঁটে যাবে কীটের জীবন

অন্বেষা

মহঃ সানারুল মোমিন

হৃদয়ের সূক্ষ্ম মরু চাতালের পাটাতনে
মৃত বটবৃক্ষের মগডালে ইচ্ছেরা স্বপ্নে
হতাশ।
অষ্টপ্রহর বৃদ্ধ সূর্যের রৌদ্র
ভেঙে চলে প্রাচীন সৃষ্টির উপন্যাস।

পল্লীর পঙ্কিল জলাশয়ে খুঁজি মানবতার
ইতিহাস।
আজও অষ্টাদশী ঋতু মাস খুঁজে আগামীর
দিগন্ত —

বড় ক্লান্ত ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ,
লুকিয়ে যায় হারিয়ে যাওয়া বিষাক্ত জ্যোৎস্নায়।
জোনাকির সান্ধ্যকালীন মৃদু মুচকি হাসি,
হয়তো এবার একটু সুযোগের সময়।

ভিজতে থাকা জন্মদিন

সোমা ঘোষ

যেভাবে পুরোনো ফুল কুঁড়ির আহ্লাদে
আবারও খুব কাছাকাছি দুপুরের ঢেউ

সূর্য নামলে জ্বর আসে প্রতিদিন পুড়ে যাওয়া অগ্নিসত্র...
দুহাত বাড়িয়ে যে ডুবোজাহাজ তলানিতে
তুমি কি ভীষণ মনোযোগী খুলে রাখা জর্জে আমাদু

শ্রীবিলাসের কথা এখনো ভোলোনি বুঝি,
মনসা তাড়িত বেহুলার নৌকো
তুলসীর গন্ধ ছুটে এলে চৌরাশিয়া সুর...

এদের মাঝে একলা বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে জন্মদিন।

সব আশঙ্কা সত্যি হয়ে গেছে

সোমপ্রকাশ ভট্টাচার্য

সব আশঙ্কাই সত্যি হয়ে গেছে
জানালার ধারে যে কাঁঠাল গাছটা এতদিন রৌদ্র-ছায়ায়, জলে নন্দিত করত
তার নীচে কয়েকজন জমা হয়েছে, হাতে তাদের করাত, কুঠার, দড়ি —
ওই গাছের মাঝামাঝি ডালে যে মৌচাক তৈরি হওয়া শুরু থেকে দেখেছিলাম,
তার নীচে আগুন ধরানোর যোগাড় করছে কয়েকজন;

পঁচিশ বছর পর অডিট হল। অডিটরদের বিদেশী অতিথির মত সমাদর করলেও,
রিপোর্ট দিয়ে গেছে, গত তিন বছরের অ্যাকাউন্টে তারা বেশ আঁশটে গন্ধ পাচ্ছে;
একটু আগে থানা থেকে বড়বাবুর ফোন এসেছিল,
যে কোন ভাবেই হোক, একঘণ্টার মধ্যে সেখানে দেখা করতে;

অনেকদিন বৃষ্টির দেখা নেই, পাম্পে জল উঠছে না,
গতবছর শীতকাল আসেনি, বিজ্ঞানীরা বলছেন, আর কোনদিন শীত আসবে না;

আমার সব আশঙ্কাই সত্যি হয়ে গেছে

সন্ধেবেলা হাইওয়েতে আমাকে একা ফেলে
তুমি চলে গেছ

বৃষ্টির কথা
মৌমিতা মিত্র

একটা বৃষ্টির কথা হোক
জলের ফাঁকে ফাঁকে মুখগুলো উঠে এসে
সাথে সাথে হারিয়ে যাক
ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের অতীতটাকে
সাদা একটা নৌকায়
পিছিয়ে যেতে দেখার মতো করে লিখি
শেষ সংলাপের পরিবর্তিত রূপ
সামনের গাছগুলো আমাদের কাছে আর
একভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না।
বরং স্বপ্নের স্মৃতি দীর্ঘ হতে হতে
গল্পের একেকটা লাইন হয়ে যাক
যেখানে আলো মেটাফর-মোনোগ্যামির, মেটামরফোসিসের
যেখানে আশু বৃষ্টির মথ কানের কাছে ফিসফিস করে বলে
বৃষ্টির কথা, ক্ষয়ের কথা।

নিঃসঙ্গতা
সুকান্ত হালদার

তাপময় সূর্যরশ্মি চেয়ে থাকে
শব্দহীন চিৎকার সুরে,
আর আকারহীন বাতাসের অনুভূতি
বয়ে চলে তার ক্লান্তিহীন সমবেদনা।

চারিদিকে শূন্য আর পূর্ণের রেষারেষি
আগুন আর জল হয়েছে সারথি
ভেবে চলে ভগ্ন হৃদয়
মৃত্যুকে কেন ভয় পায়?

নগ্ন পাথর কণ্ঠে, শেষ বাক্য —
লক্ষণরেখা ভেদে যাব
কবে রহস্যময় দেশে?

পরিযায়ী

মতিউর রহমান

এই সেই মেঠোপথ, কাশবন পেরিয়ে
ব্যাগ কাঁধে স্কুল যেত ওরা
মেঠো হাওয়ার সমুদ্রে স্বপ্ন ভাসিয়ে
ওরাং ওটাংয়ের মতো একে একে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙিয়ে
গাদা গাদা ডিগ্রি —
প্রত্যাশার পুকুরে পদ্ম ফোটেনি
শূন্য ভাতের থালায় ভনভন করে মাছি
দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন
বাবার চিকিৎসা, বোনের বিয়ে
যেদিকে তাকায় কুয়াশায় বাজে বেদনার বীণ
কুয়াশা চিরে জোনাকির খোঁজে
দলে দলে চলেছে ওরা
পরিযায়ী পরিচয়ে ...

এইভাবে প্রতিদিন কত শত হাজার —
স্বপ্নের শবদেহ কাঁধে হেঁটে যায় যুবকবেলা
পেছনে পড়ে থাকে শৈশবের খেলার মাঠ, কাশবন
আর মানসপ্রিয়ার চোখ বেয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়া
দু'ফোটা উষ্ণ অশ্রু ...

আত্মসমীক্ষা

রামকৃষ্ণ বড়াল

সময়ের স্রোতে ভাসিয়েছি গা, চলেছি অনুকূলে।
বিপদে যাঁরা ছিলেন পাশে গিয়েছি তাঁদের ভুলে।।
প্রতিষ্ঠিত আমি, চাকরিটা দামি, অহং ভরা মুখ।
বিষয় বাসনায় পড়েছে চাপা বিগত দিনের সুখ।।
নতুন আপন, নয়া উদ্যম, স্বপ্ন রঙিন দু’টি চোখে।
কত আপন হয়েছে যে পর, উপেক্ষার গ্লানি মেখে।।
পড়েছি ঈশপ, ঠাকুমার ঝুলি, নীতিমালার গল্প।
শিক্ষা বন্দী বইয়ের পাতায়, বোধটা আমার অল্প।।
বিনয়ী আমি, স্বার্থপর নহি, দেখাতে পারি বেশ।
অভুক্ত মানুষ পথের পাড়ে, নেইতো কোন ক্লেশ।।
স্বার্থের চারা করেছি রোপণ, মনের মহাকাশে।
অতৃপ্ত আত্মা করছে নৃত্য, পৈশাচিক এক উল্লাসে।।
গরীব জানে ক্ষুধার জ্বালা, পথ্য বেজায় অমিল।
চড়ছি আমি সখের মোটর, দু’চোখে স্বপ্ন নীল।।
নাই বেশভূষা, দারিদ্রে ভরা, অভাগা এই দেশ।
দু’গালেতে অশ্রু নামাই, চালাকিটা জানি বিশেষ।।
শহীদের গাথা পতাকার রঙে, স্বাধীনতার নিশান।
বিবেক দর্পনে মৌন আমি, এক দুরাচারী বেইমান।।

দৃশ্যের ভেতর লুকোনো দৃষ্টিতে

আমিনুল ইসলাম

তারপর জানলা খুলে বেড়িয়ে যাওয়ার সময়
বিপরীতে একটাও চোখ ছিল না বরং কিছু নিতম্বের সুডৌল এ
অশ্লীল ভাব ও কানপাতলা শব্দের সন্ধ্যায় মোটেই নাক উঁচু হল না

দেখেছিলাম তুমি চলে গেলেই পুকুর ফাঁকা
পাঁকের আবরণে ঢাকা কিছু জিওল

অপরপ্রান্তে আবছা ঘরের ভেতর এক তুফান গুমরে গুমরে গুম মেরে

দীর্ঘ সময় পার হলে একদিন গাছের পাতা ডালপালা কাণ্ডজ্ঞানহীন
ভেঙে পড়ার উপক্রমও এই অন্ধকারকে কামিয়ে ভালোবেসেছিল

তখন একান্ত বুদ্ধাবকাশ ঘিরে নিরুপায় দাঁড়িয়ে থাকা এক ভগবান
আকাশের উদ্দেশ্যে কিছু কাগজের এরোপ্লেন বানিয়ে ওড়ালেন

শিশির কণা

আনসারুল ইসলাম

আজ প্রভাতের সূর্য যখন ধানের শীষে খেলে
মন ছুটে যায় দূর নীলিমায় মুক্ত ডানা মেলে।
আকাশ মাটি বন্ধুর বেশে মিলেছে দূর্বা ঘাসে
হাজার শিশির বিন্দুগুলো প্রাণ খুলে হাসে।।

কে দিয়েছে রঙের ছোঁয়া দূর্বা ঘাসের পরে
হাজার রঙের শিশির কণা ছড়িয়ে তেপান্তরে।
দূর্বা ঘাসের শিশির কণা একেকটি ঝাড়বাতি
রোজ প্রভাতের সূর্য আলো ঝলমল সাথী।।

সরষে ফুলের শিশির বিন্দু সবুজ গায়ের দেশে
দূর হতে ওই দিচ্ছে আলো হাওয়ার মধ্যে ভেসে।
পথের পাশের বনফুল যত রঙ নিয়েছে তার
আলো ঝলমল রোদ্র সকাল দিয়েছে উপহার।।

আজীবনের অচেনা অন্তর

অনামিকা রায়

তুমি আমাকে চেনো? চেনো আমায়?
কি বললে? চেনো!! হাঃ হাঃ হাঃ, বটে?
বলছো যখন,
তাই শুনছি আমিও, যা রটে,
তার কিছুটা বটে।

আমার মধ্য গগণ,
হাড় হিম,
আমার গভীর চাউনির শীতলতা,
বামে জমা জলের ব্যথাতে
ঢোক গেলা কাঠ গলা।
আমি জমতে থাকি নীল হয়ে
ইনসোমনিয়া সাথে,
তুমি মাশরুফ
তোমার মুলাজ্‌মাতে।

এলোমেলো ঘুরপাক
মনের জটিল গলি
যেনো হুবহু
সালকাস জাইরাস,
খাঁজে ভাঁজে জমে আছে
উল্কি আঁকার রং,
আমি চিনি না আমাকে আজো
তুমিই চিনে নাও বরং।

কোথায় গেল

দীননাথ মণ্ডল

কোথায় গেল হারিয়ে যেন
সোনালি সেই বেলা।
বিকেল হলেই পশ্চিমেতে
সিঁদুর সিঁদুর খেলা।।
দল বেঁধে সব বকের সারি
চলত উড়ে উড়ে।
মেঘের গলায় শঙ্খমালা
ওই দিগন্তের দুরে।।
পাখপাখালি গাছের ফাঁকে
দিয়ে যেত হাঁক।
কিচিরমিচির কলরবে
বাসায় ফেরার ডাক।।
সাঁঝের বেলা জোনাকিরা
জ্বেলে দিত আলো।
বলত ঠাম্মা সুরে সুরে
গল্প কথা ভালো।।
একটু বাদেই উঠত যে চাঁদ
নীল আকাশের বুকে।
যেতাম আমরা হারিয়ে সব
চাঁদের মাঝেই ঢুকে।।

নীরবতা

অনিল কুমার প্রামাণিক

সবুজ ঘাসে পাশে বসে নীরব হয়ে রই,
অনেক কিছু বলার ছিল — শুনলে তুমি কই?
তোমার চোখে চোখ রেখেছি শান্ত গভীরতা,
মনের কথায় ব্যাকুল হলাম — তবুও নীরবতা,
মেঘের কোলে রোদের খেলা তাকিয়ে আমি দেখি
অবাক চোখে সেই সুযোগে আমায় দেখ নাকি?
একটিবার দেখতে পারো
তোমার আকাশ অনেক বড়
আমার হৃদয় তোমার লাগি বৃষ্টি দিতে পারে,
তুমি কেন নীরব থাকো স্তব্ধ নদীর ধারে।
বোবা হয়ে রইলে তবু মনের কথা বুঝি,
ভালবাসার হৃদয়খানি চোখের মাঝে খুঁজি।
মুক্ত মনের সুযোগ পেয়ে নিলে না মোরে কাছে
নীল আকাশে মিলিয়ে যাব পাবে না আর খুঁজে।
সূর্য যখন অস্ত যাবে
স্বপ্ন তোমার বিলীন হবে
তখন তুমি প্রান্তে গিয়ে করবে স্মৃতির খেলা,
আমি যাবো অস্তাচলে জীবন সন্ধ্যা বেলা।
সময় পেয়েও উঠল না ঢেউ শান্ত সাগর জলে
জীবন নদী বয়ে যাবে রইবে স্মৃতির কোলে।

যে আলপনা চিরহরিৎ

স্বর্ণেন্দু ঘোষ

কখনও কখনও কোনও কবিতার একটা বা দুটো লাইন মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। সেটা হয়তো ‘আবার আসিব ফিরে’ বা ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’ ইত্যাদির মতো অতি জনপ্রিয় কোনও কবিতার লাইন নয় অথচ কোনও অবসরে চুপিচুপি ফিরে আসে। আজ তেমনই দুটো লাইন বারবার ফিরে আসছে; ‘বাবা বলেছিল, রেখে দে পরে পরবি / ত্রিশ বছর পরে জামাটা এখনও কত বড়।’ কবি হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটা কবিতার দুটি লাইন। কোন কবিতা, কোন কাব্যগ্রন্থ মনে পড়ছিল না তাই তাঁর সকল বইগুলো নিয়ে বসলাম আজ সকালে। কিছুটা খোঁজাখুঁজির পর ‘রোদে ভাতের আলপনা’ কাব্যগ্রন্থে পেলাম সেই প্রিয় কবিতাটি। কবিতার নাম ‘বাবার জামা’। আরও একবার পড়লাম —

‘আজ হঠাৎই বিকেলে
বাক্স খুলে দেখি
বাবার একটা জামা

আকাশের নীল
অনেকটাই মেঘে খেয়ে নিয়েছে
বোতাম সাতটার কথা
আজ আর কেউ বুঝতে পারল না
কলার শোভা পাবার মতো
কোনো রোদ্দুরের গলা নেই

বাবা বলেছিল, রেখে দে পরে পরবি

ত্রিশ বছর পরে জামাটা এখনও কত বড়।’
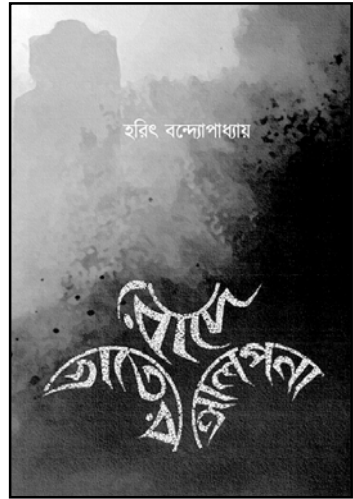
‘রোদে ভাতের আলপনা’ কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি সংকলিত হওয়ার বহু আগে কবিতাটি পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। একটি গদ্যে এই কবিতাটির প্রসঙ্গে লিখেছিলাম — এমন কবিতা পড়ার পর অনেকক্ষণ একটা অবাক আবেশ থেকে যায়। একটিবারও ‘রামধনু’ শব্দটা এল না অথচ সাতটি বোতামের প্রতীকী ব্যবহার বলে গেল তারই কথা। ‘ত্রিশ বছর পরে জামাটা এখনও কত বড়’, বাবার জামা তো চিরকালই বড় থেকে যায়, তাই না? আমরা কি চাইলেই তাঁর মত রোদ্দুর হতে পারি? অথচ বাবা বলে গেছিলেন, ‘রেখে দে পরে পরবি’। এই পর বোধহয় সারা জীবনেও আসে না!

কবি হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু কবিতার লাইন এমন ভাবেই ফিরে ফিরে আসে। আমি বোঝার চেষ্টা করি কেন আসে? কী আছে কবির লেখায় যা এমন ভাবে টানে! কখনও আমরা যদি কবিতাকে আয়না হিসেবে দেখি আর তাতে নিজের জীবনের ছবি যদি ধরা পড়ে, নিজের অনুভূতির প্রতিবিম্ব যদি দেখতে পাই তবে সেই আয়না, সেই কবিতা, সেই কবি হৃদয়ের কাছাকাছি চলে আসে। বাবারা চিরকাল আমাদের জীবনে রোদ্দুরের মতো হয়ে থাকেন। তাঁরা সন্তানের কাছে আলোর মতো। সেই আলোর মাঝেই কত কত রং লুকিয়ে থাকে! ছোটবেলায় আমরা ভাবি, একদিন ঠিক বাবার মতো বড় হব। বড় হয়ে উপলব্ধি করি বাবার মত বড় হওয়া যায় না কিছুতেই। এই উপলব্ধি কি শুধু কবির নিজের? আপনারও কি নয়? এই যে ছোট্ট ছোট্ট কিছু শব্দ দিয়ে বিরাট একটা সামষ্টিক অনুভূতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা, এটাই কবি হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার সব থেকে বড় শক্তি। হয়ত ঠিক এই কারণেই এই রকম ছোট ছোট দুয়েকটি লাইন মনের মাঝে গেঁথে যায় আর বারবার ফিরে আসে।

বইটি হাতে তুলে নেওয়ার পর শুধু এই কবিতাটি পড়েই থেমে থাকতে পারলাম না। পরপর আরও কিছু কবিতা পুনরায় পড়তে থাকলাম। এবার ‘শুকতারা’ নামে একটা কবিতার প্রসঙ্গে আসব। কবিতাটি মা’কে নিয়ে। এই কবিতাতেও দুটো এমনই লাইন রয়েছে, মাঝে মাঝেই মনে আসে — ‘আগে শুরু কর / পড়তে পড়তে সব আলো হয়ে যাবে।’ মা ছেলেকে ভোরের শুকতারা দেখে ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছেন পড়তে বসার জন্য। ছেলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলছে, মা এখনও তো গভীর অন্ধকার। তখন মা বলছেন, ‘আগে শুরু কর / পড়তে পড়তে সব আলো হয়ে যাবে।’ বহুদিন আগে কবি হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে লিখেছিলাম — কখনো কখনো তাঁর কবিতা অ্যালেগরিক্যাল (allegorical); সোজাসাপটা একটা অর্থের আড়ালে রয়েছে সুগভীর দর্শন। শেষ লাইনটির প্রসঙ্গে ঠিক এই কথাটিই মনে এল। পড়তে পড়তে সব আলো হয়ে যাবে — মা দিনের আলো ফোটার কথা বলেছিলেন ঠিকই। তবে এই আলো কথাটির মধ্যে কি এনলাইটমেন্ট বা উদ্বোধ শব্দটি লুকিয়ে নেই? মা কি বলছেন না, আগে শুরু তো কর তারপর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উদ্বোধ তোর পিছু পিছু আসবে? আগে শুরু তো কর, তারপর একদিন ঠিক তুই আলোকিত মানুষ হতে পারবি। কী সহজ একটি পঙক্তি অথচ কী গভীর দর্শন।

'রোদে ভাতের আলপনা' কাব্যগ্রন্থ এমনই অসংখ্য মণিমাণিক্যে ভরা। এবার আরও একটি কবিতা তুলে নেব যেটি আমার খুব প্রিয় একটি কবিতা। কবিতাটির নাম 'আদর্শ সৈনিক'।

'সারাদিন
দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার পর
সন্ধেবেলা
যে সৈনিক হেরে যায়
সে আমার জীবনের বড় আদর্শ'

কবিতাটির ঠিক এইখানে এসে থমকে যেতে হয়। সাধারণত আমরা বিজয়ী বীরের কাছে মাথা নত করি। তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। পরমবীর আখ্যা দিই। কে মনে রাখে হেরে যাওয়া সৈনিক কে? কে তাঁকে নিজের আদর্শ বলে মনে করে? তাহলে এবার এই কবিতার পরের অংশটি পড়া যাক।

'তার মধ্যে
আমি একজন পরিপূর্ণ সৈনিককে খুঁজে পাই
আলো জ্বালা থেকে নিভে যাওয়া
সবটুকু তার নখদর্পণে

আমার সামনে
সে এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।'

কবিতাটা শেষ করার পর এই সৈনিকের জায়গায় আমি নিজের বাবাকে দেখতে পেলাম। সারাদিন যুদ্ধের শেষে পরিবারের কাছে আত্মসমর্পণ করা মানুষটিকে দেখতে পেলাম। আপনি কি পেলেন? বা নিজের মাকে খুঁজে পেলেন, যার কাছে সংসারের আলো জ্বালা থেকে নিভে যাওয়া সবটুকু নখদর্পণে? 'সৈনিক' এ কবিতায় একটা মেটাফর (metafore) মাত্র, একটা আড়াল যা কবিতাটিকে অ্যালেগরিক্যাল (allegorical) করে তুলেছে।

প্রকৃত শিল্পী যেমন সামান্য কয়েকটি সহজ অথচ বলিষ্ঠ রেখার আঁচড়ে অসাধারণ চিত্র রচনা করতে পারেন, হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তেমনই সহজ সরল শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ নিয়ে রচিত অথচ নির্মাণ কত বলিষ্ঠ। আমি কখনও কবিকে এমন শব্দ প্রয়োগ করতে দেখিনি যার অর্থ খোঁজার জন্য আমাকে অভিধানের দিকে হাত বাড়াতে হয়েছে। সাধারণ শব্দ দিয়ে সাধারণ বাক্য হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের ছোঁয়ায় অসাধারণ হয়ে ওঠে। একথা আমি আগেও বলেছি। 'তোমার গল্প' নামে একটা কবিতার

ছোট্ট একটা অংশ তুলে দিই।

'গল্প মানে তো
দুটো গাছ, কয়েকটা মানুষ
একটা নদী
জলের কষ্ট হবে বলে
দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে নদীর গল্প এগিয়ে যাবে'

সাধারণ শব্দ দিয়ে কী অসাধারণ নির্মাণ! কবি এরপর যখন লেখেন, 'নদীতেই বা সারাবছর জলকষ্ট থাকে কেন', তখন এই নির্মাণে কী সুন্দর এক দ্যোতনা যুক্ত হয়! অন্তরঙ্গের কথা বাদই দিলাম, বহিরাঙ্গের এই সাজও পাঠককে মুগ্ধ করে। নদী তো বুক ভরা জল নিয়ে প্রবাহিত হওয়ারই কথা, তবে কেন নদীতেই সারাবছর জলকষ্ট থাকে! এবার 'মুখোমুখি' কবিতার একটি অংশ তুলে নিই।

'তোমার দুঃখ পাহাড়
আমার না হয় টিলা

খুঁড়তে
খুঁড়তে
খুঁড়তে

পাথর
মাটি
জল'

সহজ অথচ কত বলিষ্ঠ এবং গভীর এই নির্মাণ। আমাদের দুঃখ যতই না পাথরের মতো কঠিন হোক, খুঁড়তে খুঁড়তে সেই পাথরের পরে মাটি পাওয়া যাবে আর তার নিচে নরম স্নিগ্ধ জল। আসলে মুখোমুখি বসাটা দরকার। তাঁর কবিতার এই প্রগাঢ় জীবন বোধ পাঠককে কবিতার আরও কাছাকাছি আনে। অথচ কোনও কঠিন শব্দ প্রয়োগ করতে হল না, কোনও আড়ালেরও দরকার পড়ল না, খুব সহজেই মাটির কাছাকাছি থাকা গেল।

এবার পরপর আরও দুটো কবিতা তুলে ধরব। একটি বাবাকে নিয়ে লেখা আর একটি মাকে নিয়ে লেখা। বাবাকে নিয়ে লেখটির নাম 'বাবার সঙ্গে'।

'বাবার সঙ্গে হাঁটি
বাবা গল্প বলে
গল্পের তালে তালে পা মেলাই

বাবাকে পেরিয়ে যাই
বাবা হাসে

বাবার পিছনে কখনও
বাবা হাসে

বাবার আঙুলে আঙুল
বাবা হাসে

বাবাদের হারা জেতা নেই
চলাতেই আনন্দ’

এবার মাকে নিয়ে লেখা কবিতাটির একটি অংশ। কবিতার নাম ‘এক গেলাস জল’।

‘... মা উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে বলল
নলে, অনেক কাজ করেছিস
আমাকে এক গেলাস জল দে তো

দেখলাম এক গেলাস জলে
গোটা পৃথিবীটা কেমন ভিজে গেল।’

দুটো কবিতার নির্মাণে কোথাও কোনও জটিলতা নেই, আড়াল নেই, অথচ কত সহজেই মন ছুঁয়ে গেল। এভাবেই বহু পাঠকের মন ছুঁয়ে চলেছেন কবি হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন কবিতার অতি জটিলতা আর দুর্বোধ্যতার জন্য পাঠক সমাজ কবিতাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন আর কবিতা শুধুমাত্র এলিট পাঠকের সম্পত্তি হয়ে উঠছে তখন আমার মনে হয় কবি হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কবিতা বাংলা ভাষায় আরও লেখা হোক। তাতে বাংলা কবিতারই মঙ্গল হবে। বাংলা কবিতা যেন আরও মাটির কাছাকাছি আসতে পারে, যে ভাবে হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রোদে ভাতের আলপনা এঁকে চলেছেন, তেমনই চিরহরিৎ আলপনায় যেন বাংলার মাটি ভরে ওঠে।

কাব্যগ্রন্থ — রোদে ভাতের আলপনা
কবি — হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশন — রা
মূল্য — ২০০ টাকা

আকাশ সমুদ্রে উড়াল

স্বপ্নদীপ রায়

কবিতা বহুমাত্রিক। বুকে আগলানো শতভাঁজপড়া জীর্ণ একটুকরো কাগজের সাদারঙ পেলেই কবির সংবেদনশীল হৃদয়পাখি উড়ে যায় নির্বিচারে, সেই বহুমাত্রিকতারই দেশে। সেখানে সংসার আছে নিবিড় মধ্যাহ্নরঙ আকাশে ছড়িয়ে, গোধূলির দু'হাতভর্তি আবীর নদীর টলটল জলে রেখে যায় চুম্বনের কালান্তর ক্ষতচিহ্ন — রাত্রি থাকে রাত্রির গভীরে চেনা শ্বাপদের পদচিহ্ন থেকেও বেশ খানিকটা দূরে আদিরসের প্রগাঢ় কোন উপকূলে --- এইরকম চিত্রকল্পময় অন্তর্দৃষ্টি পাঁজরের ভিতরে ফসল করে একটা ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে বন্যগুহায় কবি অনায়াসেই করতে পারেন তাঁর নিভৃতযাপন — আর সেই যাপনঅভিজ্ঞতা থেকে মন্থিত হয় এক সোনালী ডানার চিল যা ঘুরে ঘুরে কক্ষজন্মাকে শুনিয়ে চলে --- মথুরার মহাদুর্গের গুরুভার — অমোঘ বিপর্যয় — বনভূমির কোমল ঘাসে শায়িত পরাজিত রক্তসিক্ত এক একনায়কের ইচ্ছেমৃত্যুর কলাকৌশল!

কবি আশুতোষ বিশ্বাসের কবিতা এইরকমই বহুমাত্রিকতার পীঠভূমি। তার কবিতাগুচ্ছ যেন কোন কবির স্বরোচিত সংবাদপত্র — সেখানে 'দেখা' আছে দৃষ্টির গভীরে, 'শোক' আছে শুকনো বীজের আকরে, 'বৃষ্টি' আছে সমুদ্রের উত্তাল বুদবুদে

... আর ‘প্রেম’ আছে নরম পুলোভারের মতো তাঁর আত্মাকে জড়িয়ে! সাম্প্রতিক তাঁর ‘প্রতিভাস’ থেকে প্রকাশ পেয়েছে একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ — ‘শীতকাল এসে গেল স্বাগতা’ — সেই নিয়ে টুকিটাকি কাটাছেঁড়ায় আনন্দ খুঁজে নেব আমরা, যারা, কবিতা নামক পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের পথিক।

‘শীতকাল এসে গেল,স্বাগতা — এবার অজ্ঞাতবাসে চলো।
ফ্রিজের বাসি পিঁয়াজের কলি, নটে শাক, প্রপিতামহের
হাতবদলি রংচটা মুখদর্শনি ঘষা-আধুলি
চলো, রেখে আসি সূর্যতাপস তপোবন থালে
সপ্তাশ্বের পায়ে ক্লান্তি নামার আগেই ...’

এখানে একটা প্রচ্ছন্ন অন্ধকারের প্রতি কবিমনের আসক্তি কবিতাটিকে বেশ তাৎপর্যবহ করে তুলছে —এই অজ্ঞাতবাস অমোঘ তবু কণ্টকের মতো বিপদসংকুল ... তাই কবি ছাওয়া চেয়েছেন অন্তর উজাড় করে ... সেই সূর্যতাপসের তপোবনকে চেয়েছেন তাঁর প্রেমমন্থিত হৃদয়ের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় ... হোক না সেখানে শীত ... তবু চাপাছাই’য়ে কবি পেয়েছেন দলাপাকানো পৃথিবীর মতো উষ্ণ প্রজননিক আশ্বাস ... এই আশ্বাসেই তিনি ধরে রাখতে চান তার ভাবসঙ্গিনীর বাহুমূল!

সমাজের ক্ষত অবক্ষয় কবিকে যাতনা দিয়েছে, তেমনি তাঁর ভারকেন্দ্রকে মুহুর্মুহু অস্থির করে তুলেছে ... ‘যুদ্ধপ্রযত্ন লড়াই অন্তে খতরনাক শত্রু শিরস্ত্রাণ খুলে রেখে মিশে যায় সান্ধ্যবাজারে ... নিকষ অন্ধকারে সারারাত সাইরেন বেজে গেছে’ ... এভাবেই ক্ষতসম্বলিত আমাদের রক্ত কোন আলো দেখতে চায় না ... কোন আকাশ দেখতে চায় না ... শুধু মরামাছের মতো বুঁদ হয়ে থাকে ডিনারটেবিলে কাটাকানকোয় মশলা লেপে! আরেকটি নিদারুণ চিত্র তাঁর কলম চুম্বন করেছে দৈন দিনলিপির মধ্যাহ্নে —

‘নতুন শহরের আলো হেঁটে মেঘ ছোঁয়াছুঁয়ি খেলে ইমারত
ভর দুপুরে বারুদে বাতাস ভারী
মিক্সির পেটে মাংসের অনুপান ঘর্ঘর
সিরিয়াল চোখ ঘুরে খবরের চ্যানেলে ভাসে
বড়ো বড়ো হরফের ব্রেকিং আপডেট
ধরাশায়ী দুই। ধরাশায়ী দুই। আহত এস টি এফ্ এক।’

এ যেন এক পৈশাচিক নগ্নতা যেখানে যৌনতার চেয়েও বৃহত্তর রাক্ষস এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে সভ্যতার রক্তচোখ বিবর্ণ বিসাদৃশ্য কলিজা !তাই শেষাংশেও

কবি চিত্রিত করেছেন এক মেঘাচ্ছন্ন বাঁজা আকাশ যে শুধুই জানে গুমোট হওয়ার ভাষা ...

‘আমাদের সুরবৈচিত্র্যে গ্রানাইট সম্প্রীতি সুদূর আকাশে
বাড়ির মালিক পরিযায়ী ভাড়াটিয়াকে টুপি পড়িয়ে
নতুন শহরের পুরোটাই ভাড়া দিয়েছে।’

তির্যক শ্লেষ প্রয়োগে কবি আশুতোষের জুড়ি মেলাভার —

‘মহামান্য আদালত প্রকৃত দুষ্কৃতির উপযুক্ত প্রমাণ না পেয়ে/ধর্ষক বলে
সন্দেহভাজিত সমাজসেবীকে বেকসুর খালাস/বলে হাতুড়ি পেটালেন।
সেই হাতুড়ির শব্দ হরপ্পার ড্রেনেজ সিস্টেম লিক করে/ফাইভ-জি-র
আন্তর্জাতিক গতিতে বাংলার গোরুর হাট ঝালাপালা।’

আরও একটি অংশে পাই — ‘সময়ের হিমালয়-বধিরতা পাপোশে মুখ মুছে হাসে একরাশ’

যুবসমাজের প্রতিনিয়ত অবক্ষয় তিনি কবিতার চশমা খুলেও দেখেছেন দৈনন্দিনের চরাচরে। এই অবক্ষয় একজন অধ্যাপককে ভীষণ পীড়িত করে তোলে। ঐ নিত্য পীড়া থেকেই একটা বক্রশ্লেষ উদগত হয় তাঁর ‘একুশের ফ্রিজ’ কবিতায় —

‘একুশ বয়সি ছেলের একুশের ফ্রিজে
নিঃসঙ্গ যাপন-পার্বণ
শঙ্কিত প্রৌঢ় বটগাছ।’

সামাজিক ক্ষতের আরেকটি চমৎকার নিদর্শন মেলে তার অন্য আরেকটি কবিতায় —

‘পায়ের তলায় ঘুঘরে পোকা এখনও যে একনিষ্ঠ সবজিশেকড় সন্ধানী
খোঁড়া শামুক দাগ এঁকে যায় শুখা পথের মাঝ বরাবর,পথিক পায়ের
শক্ত জুতোর সোলে নরম কিছু ঠেকল কি? সঙ্গে আমার ইচ্ছে-বাসন...’

সেই অনুবোধেরই অভাব অনুক্ষণ ক্ষতবিক্ষত করছে আমাদের সমাজচেতনা--জীবনচেতনাকে--

‘নিথর হৃদয় কি একটু করুণ হতে পারে না?
পারে না কি ভুলতে যন্ত্রশোক —
বিগত মাসে ভেঙেছে অনেকগুলো হাড়

আরও কতগুলো এমাসের বরাদ্দ
তবু হিমালয় হয়ে ওঠে জুতোর সোল —
সম্ভোগের উথল দুধে সভ্য মেশায় নুনের ছিটে
তবুও ভাঙা মেঝেয় ইচ্ছে-বাসন
শিখতে চায়নি একটু... বোধ!' (স্বপ্নদীপ)

শিকড়ের সন্ধান পিয়াসি কবি খুঁজেছেন প্রেম — সে গৃহপালিতের গৃহদাহ ছাড়িয়ে একছুটে চলে গেছে কৃষকের রুজির পান্তাসিঞ্চিত প্রণয়প্রান্তরের বিশালতায়-ভালোবাসার হাত! উসে যে একবার ছুঁয়ে না গেলে আর্তের শরীরে লালন করে আত্মঘাতী আর্তনাদ!

'তোমাকেও মাঝে মাঝে ভূতে পায়।...
দুঃখের অভিনয় সফল সব অভিনেতার
লজ্জাবতী রোমকূপ বাগান
একমাত্র জানে রচয়িতা।
তুমি তো পরিহিত বাঘছাল, বাঘিনীর বেশে
প্রমত্ত আক্রোশে নখের আঁচড়ে ছেঁড় সোলার বালিশ।
আমাদের এই রাঢ়ি বাংলায় রবি আর খরিফের
মাঠে বোনা কৃষকপ্রণয়। গর্ভের প্রাজ্ঞ অপেক্ষায়।'

এই অপেক্ষা যেন সমুদ্রের অতলস্থিত ফ্যানার মতো ঘুরে ঘুরে পাঠকদের নিয়ে যায় অসুরক্ষিত অস্থির সময়ের চৌকাঠে — এখানেই কবিমানসের অমোঘ সার্থকতা!

আরেকটি চিত্রকল্পে কবি চেনার মাঝে অচেনাকে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে পাড়ি জমিয়েছেন অলীক নিরুদ্দেশ্যে —

কই গো, কে আছো বাড়ি?
দেখ, পাঁচ কিলো চারশো ওজনের
কাতলা মাছের কানকোয় দড়ি বেঁধে মাছ নিয়ে
এসে গেছি আজ খুব তাড়াতাড়ি
কই গোঁ, কে আছো বাড়ি? মাছটা ধরো —

এই যা —
আমি কি ভুল করে ঢুকে পড়েছি
আমাদের বাড়ির মতোই এই বাড়িটি

হ্যাঁ, এটাই আমাদের বাড়ি।
এখানেই থাকত স্বাগতা, কুটত ব্যঞ্জন
মুখে মুখে কথার ঝনঝন
কই, দেখছি না-তাকেও ?
না। তবে এ বাড়ি আমার নয়।

বাড়ি খুঁজে না পেয়ে কানকোয় দড়ি ঝোলানো মাছটা
অপরিচিত মানুষটাকে পিঠে বসিয়ে আকাশ সমুদ্রে
উড়াল দিল' —

চিত্রকল্পে দুই হারিয়ে যাওয়া সেই অন্ধছায়ার মতো মিলেমিশে একাকার হয়ে একটা বিমূর্ত ক্যাভিটি রচনা করল--this unfulfillment is an irony when one loses his own entity inside his crystal leaving him no choice but to surrender to the ultimate calamity..

অন্তে তুলে ধরব কবির শব্দশিল্পের নিপুণ দক্ষতা —

'শব্দ ব্রহ্মা
যুগ যুগ আমাদের সূর্যাবর্তের খৈলানে
শব্দবীজ ছড়িয়ে পড়ে
মুষ্টিমেয় সন্ত কিছু ভরে নেয় সাধের ঝুলিতে
আর আমাদের ই-প্রজন্মের নাঙ্গা সাধুর জটা
ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠ ছাড়িয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যায়।'

সেই ইয়েটস সাহেবের কথা ফিরে ফিরে আসে —
'Things fall apart; the center cannot hold'

সবমিলিয়ে বেশ জমাটিয়া হয়ে উঠেছে কবির যাপনউৎসব। তাঁকে কাব্যগ্রন্থটির জন্য অসংখ্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

কাব্যগ্রন্থ — শীতকাল এসে গেল স্বাগতা
কবি — আশুতোষ বিশ্বাস
প্রকাশন — প্রতিভাস
দাম — ১৫০ টাকা

রুদ্রপলাশ মণ্ডলের

‘ধুলোপথের বিনিদ্র কথা’ প্রসঙ্গে

অলোক বিশ্বাস

নতুন কবিতার মাধ্যম হিসেবে আমরা পেয়েছি মেধার নান্দনিক ভাষাশিল্প। মেধার নান্দনিক ভাষাবিন্যাস নির্মাণে প্রধানত সাহায্য করে বাংলা কবিতার পরম্পরা। বহুমুখিতার স্বরূপ বাংলা কবিতায় এনেছে নতুন আঙ্গিক, বিষয়কে উপস্থাপনার অপর সিনট্যাক্স ও সিমানটিক্স। বাংলা কবিতার ইতিহাস বলে, এগিয়ে থাকা বাংলা কবিতা নিয়মিত তীব্র প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হয়েও পরবর্তী প্রজন্মের পাঠক নিরীক্ষাসমৃদ্ধ কবিতাকেই গ্রহণ করছে এবং তারা জানে বাংলা কবিতার পুনরাবর্তিত রূপকে অবলম্বন না করলে আপামর পাঠকের বাইরের ভিন্নতর সাধকদের কাছে তাদের কবিতা আদৃত হবে না। কবিতা হলো হৃদয়ের সহজাত ব্যাপার যা, মাত্র আবেগের স্ফূর্তি ধরে এলে তবেই লেখা হবে, এরকমটা আর এখন বিবেচনা করা হয় না, অন্তত নয়ের দশক পরবর্তী বাংলা কবিতায়। কবিতা এখন সচেতন নির্মাণের প্রয়াস। স্বতঃস্ফূর্ত সহজাত প্রকাশ মাধ্যম বাংলা কবিতায় মেধাকে নির্মিতির প্রয়োজনীয় ইন্সট্রুমেন্টাল মনে করে না। ফলত, মেধাহীন সহজাত আবেগ বাহুল্যের কবিতার আকর্ষণ থেকে সরে যাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম।

আমি যখন রুদ্রপলাশ মণ্ডলের ‘মাটি ও মেঘের কথা’ নামে কবিতা পড়ছি, একটা

পংক্তিতে পৌঁছে আমার বিস্ময় ঘনীভূত হলো। কয়েকবার পড়লাম — 'যে মেঘ বন্যার জন্ম দিতে পারে পাথরকেও সে/মাটি করে দিতে জানে'। তারপরে শেষ স্তবকে কবি লিখছেন — 'মেঘ আসবে — চলেও যাবে/সব মেঘেই তো আর পাথর গ'লে মাটি হয় না'। এই কবিতায় কবি যেমন মেঘের বন্যাজনিত ক্ষতের কথা লিখেছেন, পাথরকে তেমনি মাটি ক'রে দেওয়ার কার্যকারিতা যে আছে মেঘের, সেই প্রসঙ্গের যাথার্থও দেখিয়েছেন। একই সাথে তাঁর উপলব্ধি হয়েছে, সব মেঘ পাথরকে গলিয়ে মাটি করতে পারে না। একই অভিধাবিশিষ্ট কোনো প্রাকৃতিক উপাদানের যে বহু পরস্পর সম্পর্কিত ধরণ আর স্বভাব থাকে, কবির সচেতন দৃষ্টিতে সেটাই উঠে এসেছে কবিতায়।

পড়া যাক রুদ্রপলাশের 'স্তিমিত আলোয়' কবিতাটি। মন্তাজের প্রকরণে লিখিত এই কবিতা। ৭টি স্তবকে বিভক্ত কবিতাটির শেষ স্তবক ছাড়া পূর্বেকার স্তবকগুলোতে পৃথক পৃথক দৃশ্যকল্প নির্মাণ করেছেন কবি। প্রথম স্তবকে লিখছেন — 'দোকানের মিথ্যুক সিঁড়িতে সিগারেট ফুঁকছিল/কয়েকটি বাক্য বিনিময়'। কল্পদৃশ্যের সার্থক প্রয়োগ। বাংলার আপামরের কবিতা এরকম ভাষায় লেখা হয় না। মাত্র কেউ কেউ লিখতে পারেন এমন কল্পচিত্রের ভাষা। এভাবে পূর্বেকার কবিতা ভাষার মিথ বিযুক্ত হয়েছেন রুদ্রপলাশ। সিগারেট ফোঁকার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ দৃশ্য বা প্রথম বাস্তব। অতীব পরিচিত আচরণ। কিন্তু রুদ্রপলাশ লিখছেন, কয়েকটি বাক্য বিনিময় সিগারেট ফুঁকছিল। এই অবধি এসে আমরা দ্বিতীয় বাস্তবের কথা ভাবতে পারি। এই ঘটনা যখন কোনো মিথ্যুক সিঁড়িতে ঘটে তখন নিশ্চিত বলা যায়, কবি ত্রিনয়নে দেখার রীতি প্রয়োগ করলেন এবং পাঠককে প্রথম ও দ্বিতীয় বাস্তবের চেনা স্পেসের বাইরে টেনে আনলেন। এই কবিতার ষষ্ঠ স্তবকের চিত্রকথনে ধরা আছে অনেক মানব বেদনা — 'আমার স্বদেশ জল চোখে/বিস্ফোরণ এনে পা রাখছিল অখণ্ড এক স্তিমিত আলোয়'। স্বদেশের মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে তার 'জল চোখে'। স্বদেশের সন্ত্রাসের কথা প্রকাশ পেয়েছে 'বিস্ফোরণ এনে' শব্দ দ্বৈতের মাধ্যমে। আর স্বদেশের দারিদ্র প্রকাশ পেয়েছে যখন সেই স্বদেশ 'পা রাখছিল অখণ্ড এক স্তিমিত আলোয়'। শুভ মানচিত্রের নির্মাণই কবির প্রার্থনা। প্রার্থনার প্রত্যক্ষ ফল কী হতে পারে কবি হয়তো সেটা স্পষ্ট করতে চান না কবিতায়। কিন্তু তাঁর নিবেদনকে সত্য ক'রে তোলেন এভাবে — 'আমরা প্রত্যেকে মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম/মিরাকেল ঘটে যাক'। এই মিরাকেলটা যে কী, সেটা ভেবে নিতে হবে পাঠককে। লক্ষ্য করার যে, 'স্তিমিত আলোয়' কবিতাটায় কোথাও কোনো বিরতিচিহ্ন — দাঁড়ি, কমা, ড্যাশ, কোলন ইত্যাদি ব্যবহার করেননি কবি। আরও অনেক কবিতায় তিনি বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করেননি।

তৃতীয় বিশ্বের একজন নাগরিক কবির সামাজিক ট্রমাজনিত শ্লেষ প্রকাশ পেয়েছে 'আমরা আহ্লাদে মরে যাই' কবিতায়। এই কবিতায় দুটো দৃশ্যকে তাঁর শ্লেষের শিকার করেছেন। 'আমরা আহ্লাদে মরে যাই' — এই শব্দগুচ্ছ একদিকে যেমন তীব্র শ্লেষের,

কবির দিক থেকে প্রতিবাদেরও। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্যে থাকা সুযোগসন্ধানী নাগরিকরা অন্যত্র ঘটতে থাকা দুর্নীতিতে যথার্থভাবে আহ্লাদিতই হন। এটাই হয়ে এসেছে নাগরিক সভ্যতার জন্মকাল থেকে। এই কবিতায় দুটো দৃশ্যের একটা হলো — 'একটা শহর ঘিরে মেরুদন্ডহীনের উৎসব'। অন্যটা হলো — 'আর একটা গ্রামের ধুলোমাটিতেই/বালি পাথরের বখরায় অতি ব্যস্ত... রুটি রুজির প্রশ্ন তো'। দ্বিতীয় দৃশ্যের ক্ষেত্রে রুটি-রুজির প্রশ্ন অনিবার্য হলেও সেখানে মাফিয়ারাজের প্রকোপে বালি পাথরের বখরা চলছে। গ্রামের মাটিতেই চলছে দুর্বৃত্তদের বখরা, রুটি-রুজির নামে। 'ধুলোমাটিতে' শব্দের সঙ্গে 'ই' যুক্ত ক'রে শ্লেষকে তীব্র করছেন কবি। গ্রামের সরল ধুলোমাটিতে যেটা ঘটার সম্ভাবনা নেই সাধারণভাবে, সেই দুর্বৃত্তায়নকে এম্ফাসিস দেওয়ার জন্য কবি ব্যবহার করলেন 'ধুলোমাটিতেই'। সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পরিবেশের জটিলতা ও নির্মমতাকে কবি ফোকাস দিয়েছেন এইভাবে। এরপর কবিতাটায় প্রসঙ্গান্তর ঘটেছে মূল প্রসঙ্গের নিরিখে।

দুর্বৃত্তায়নের বিরোধিতা করার ফল প্রতিবাদকে নিস্তব্ধ ক'রে দেওয়া। গ্রামীণ মাফিয়ারাজ ব্যবহার করে আগুন ও বারুদ, প্রতিবাদকে নিস্তব্ধ ক'রে দেওয়ার কাজে। কবি লিখছেন — 'চিত্রনাট্য হয়ে গেছিল জমে ক্ষীর'। এর অর্থ প্রশাসনিক সহায়তায় দুর্বৃত্তায়নের বারুদ ও আগুন সামাজিক চিত্রনাট্যকে জটিল করেছে। কোনো অজুহাতে সামাজিক অধঃপতনের কঠিন দিকগুলো সম্পর্কে বিমুখ থাকতে পারেন না কবি। এই কবিতার পঞ্চম স্তবকে কবি আরও ঘনীভূত করলেন সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অভিশাপগুলোকে। ওই কবিতার পঞ্চম স্তবকে যেসব বিষয় উঠে এলো — ১. নেপথ্য সঙ্গীতে অনন্ত বেহাগ। ২. দৃশ্যজুড়ে মানুষ পোড়ার গন্ধ। ৩. কবির মনে পড়ে যাচ্ছে দেড় দশক আগেকার কোনো নির্মম নিস্তব্ধতার স্মৃতি। ৪. মানুষ পোড়ার কারণে প্রতিবাদের মোমবাতি মিছিল। ৫. নীরব শোকযাত্রার ঘোষণা। তো কবিতার শুরুতেই ইঙ্গিত ছিলো, কবি তাঁর কনটেন্টের ক্লাইম্যাক্সের ছবিকেও বিবৃত করবেন। এরপর তিনি লক্ষ্য করছেন, প্রতিবাদী মুখগুলোকে কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। মাফিয়ারাজ এবং মেরুদণ্ডহীনদের সমর্থিত প্রশাসন নেমে পড়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে যে, প্রতিবাদের কোনো দরকার নেই। এই পদ্ধতি কার্যকর না হলে, অনুদান আর ঘুষের প্রলোভনে প্রতিবাদকে নিস্তব্ধ ক'রে দেওয়ার প্রচেষ্টা। পকেটে পকেটে টাকা ঢুকছে এবং অদৃশ্য ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়েও যাচ্ছে সেই টাকা। আর সাধারণ প্রতিবাদী মানুষ সেভাবে উপকৃত না হয়েও একসময় অনুগ্রহকে ঐশ্বরিক বলে মনে করে। এভাবে কম্প্রোমাইজের দৃশ্যগুলো কবির চোখ এড়াতে পারে না। কী করুণ অবস্থায় পৌঁছে মানুষ অনুগ্রহকে ঐশ্বরিক প্রাপ্তি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয় ! এই কবিতার শেষ স্তবকটা শ্লেষের আকারে কবির অবস্থান নির্ণয় করে। তিনি শেষ স্তবকে লিখলেন — 'মানুষ পোড়ার সম্মেলনে উদার গন্ধটুকু সুবাস হয়ে/হৃদয় মাতিয়ে দিক আর/আমরা আহ্লাদে মরে যাই।' মেরুদন্ডহীন সুযোগসন্ধানীরা মানুষ পোড়ার গন্ধ

পেলেও সেটাকে তারা স্বীকার করে না। মানুষ পোড়ার গন্ধ ট্রান্সফার্ড হয়ে যায় উদার সুবাসে। মেরুদন্ডহীনদের হৃদয় মেতে ওঠে এবং তাদের জীবন আহ্লাদে ভরে যায়। মর্মান্তিক এই চিত্রনাট্য এঁকে দিলেন কবি রুদ্রপলাশ তাঁর 'আহ্লাদে মরে যাই' কবিতায়।

বৃষ্টি আগুন বারুদ মিছিল চাঁদ নারী জল — এসব উপকরণ ঘুরেফিরে এসেছে রুদ্রপলাশের কবিতায়। ওঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থের 'ধুলোপথের বিনিদ্র কথা' নামকরণ বলে দিচ্ছে কবিতা গ্রন্থটির নির্যাস। প্রথম গ্রন্থ হিসেবে যথেষ্ট পরিণত এই কাব্য। যেকোনো পাঠকের প্রথমেই চোখে পড়বে রুদ্রর কবিতার আপডেটেড ভাষা। পাশাপাশি আছে কিছু পিছুটান। প্রথম গ্রন্থ হিসেবে স্বাতন্ত্র্য টানটান বজায় রাখাটা প্রশ্ন চিহ্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেই। কোনো লিজেন্ডারি বাঙালি কবির প্রথম গ্রন্থেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় অজস্র দুর্বলতা। জীবনানন্দ দাশের 'ঝরাপালক' পাঠ ক'রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নিরূপিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, কবিতার স্ট্রাকচার নিয়ে অনেকরকম নিরীক্ষা পদ্ধতি রাখা আছে রুদ্রপলাশের এই গ্রন্থের কবিতায়। অনেক সময় কোনো কবির প্রথম বইতে নিরূপিত ছন্দের গতানুগতিক পেলব ভাষার বেশকিছু নিদর্শন দেখা যায়। অথচ এই গ্রন্থে নিরূপিত অন্তমিলযুক্ত প্রবণতার পরিবর্তে ভাষাবিন্যাসের মাধুর্যই আমাদের চোখে পড়বে। তবু কোথাও কোথাও কলাবৃত্ত এবং মিশ্রকলাবৃত্তের প্রয়োগ রেখেছেন। 'ক্ষয়িত স্বপ্নের ঘোর' কবিতাটা কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা — 'চুপিসারে মন জোছনার দিকে/মায়াবী হওয়াতে জাগে চর/গভীর রাতের তারা/ছলছল চোখে গিলে নেয়/দারুণ ছোঁয়াচে জ্বর'। তৃতীয়ত, সামাজিক ও মানবীয় প্রকৃতির প্রভাবকে, বিশেষ করে ওইসব পরিবেশের জটিলতাকে অপর মনস্তত্ত্বের কবি উপেক্ষা করতে পারেন না। আগাপাছতলা বিমূর্ত ভাষা ও পরিভাষার কাব্যিক প্রবণতায় যে রুদ্রপলাশের আস্থা নেই, ওঁর প্রথম কাব্য সেই কথা নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিচ্ছে আমাদের। রুদ্রপলাশ কবিতার উপকরণ প্রকরণকে প্রথম থেকেই মুক্তক রেখেছেন। মানবীয় থেকে সামাজিক, ব্যক্তিক থেকে নৈর্ব্যক্তিক সংকট জটিলতা ক্লান্তি সুখ মনখারাপ সবকিছুকেই ব্যবহারে স্বাধীনতা দিয়েছেন কবিতায়। অনেক অ্যাডভেঞ্চারের পরেও বেশ কিছু মনখারাপ থেকে যায় একজন সংবেদনশীল মনযুক্ত ব্যক্তি কবির। তাঁর পর্যটনী অনুভূতিমালা রেখে যায় মনখারাপের কিছু দলিল যা নস্টালজিয়া হয়ে ফিরে আসতে থাকে। 'ক্ষয়িত স্বপ্নের ঘোর' কবিতার প্রথম স্তবকটা রুদ্রপলাশের কবিতা ভাবনার অনেক কিছু বলে দিচ্ছে — 'হাত রেখেছি অক্ষরেখার উপর, জাহাজ ভাসে/দ্রাঘিমা রেখার জলে/রোদ্দুর দিন পেরিয়ে যাচ্ছে ভুবন, কেমন যেন/মনখারাপের আর্তি ঘিরে ধরে'।

কাব্যগ্রন্থ — ধুলোপথের বিনিদ্র কথা
কবি — রুদ্রপলাশ মণ্ডল
প্রকাশন — গীর্বান
দাম — ১৬০ টাকা

Edited by Koushik Baral, Printed & Published by Smt. Dipa Baral from Satui, Murshidabad and Printed at Jayasree Press, 91/1B, Baithakkhana Road, Kol.-9